বাঙ্গালা চরিত।

প্রথম ভাগ।— ২য় ভাগ।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম্‌মেশিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৬ সাল।

সূচিপত্র।

বাঙ্গালী চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রার্থনা।

আমার একটি চাকরি চাই। কিন্তু কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে? এ ভবসংসারে যে দিকে তাকাই, শূন্যময় বোধ হয়। ডাকিলে কেহ উত্তর দেয় না, তোষামোদ কেহ গ্রাহ্য করে না, পায়ে ধরিলে, কাহারও পা—পাষাণ নড়ে না। এ জগৎ আমার পক্ষে এখন বিজন কানন। দুঃখিনী মাতা আজন্ম আশা করিয়া আছেন, পুত্রের রোজগারের ধনে সুখী হইবেন; এক্ষণে নিরাশ-ব্যঞ্জক দুই একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস দেখিয়া, আমার এক ছটাক করিয়া গায়ের রক্ত প্রত্যহ জল হইয়া যাইতেছে। পাঠাবস্থায় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে বলিতাম, 'প্রিয়ে! আর কিছুদিন সবুর কর, আর দুই বৎসর বাদে তুমি যে গহনা চাহিবে, আমি সেই গহনাই দিব। তখন আর যদুর দোকানের নাসিকা জোড়া চল্লিশ নম্বরের কালাপেড়ে সাটী পরাইব না—ফরাস-ডাঙ্গা লালবাগানের ৫ টাকা জোড়, মিহির উপর থাপ—

মতিপেড়ে, কাশীপেড়ে রেলরোড পেড়ে—কিমধিক, আর গোপালের তাঁতের সাত টাকা জোড়া ঘোর কালাপেড়ে কাপড় অষ্টপ্রহর পরাইব। (১) যখন নিমন্ত্রণ খাইতে কিম্বা পূজা দেখিতে অপরের বাটী যাইবে, তখন ঢাকাই কি বেণারসী সাটী তোমার অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করিবে। যদি আমার কটকে চাকরি হয়, তাহা হইলে কটকপ্রস্তুত স্বর্ণ এবং রৌপ্যনির্ম্মিত বিবিধরূপ উত্তম উত্তম ফুল তোমার কুণ্ডলীকৃত কালবিষধরের তুল্য খোঁপায় বাহার দিবে।" কিন্তু হায়! এ সকল কথা এখন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। মনে করিয়াছিলাম, দুই বৎসর বাদে এত ঐশ্বর্য্য হইবে, কিন্তু এখন দু-দুগুণে চারি বৎসর গত হইল, তবু সে দিন আসিল না। পঞ্চম বৎসরে পড়িয়াছি, তবুও সে দিন আসিল না। কবে যে আসিবে, তাহাও জানি না। প্রিয়ার সেই অপরিস্ফুটিত, পরিপাণ্ডুমুখকান্তিতে কেবলমাত্র-ব্যক্ত মনোভাব দেখিয়া, আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিয়াছে। এ ভগ্নদেহে, একবার ছয় মাস কাল জ্বর ভোগ করিতে হইয়াছিল; একটা দুর্ব্বুদ্ধি চাকর আমার সেবা শুশ্রূষা করিত; তার আশা ছিল, আমার চাকরি হইলে

---

(১) আমার এক বৃদ্ধপিতামহ ছিলেন। তিনি বলিতেন, গোপাল যেমন কালার পাড় করিতে পারে, তেমন আর কেহই পারে না। অপরের কালাপাড় ধোপে ধোপে বিগতশ্রী হইয়া ফেকাসে হইয়া যায়; কিন্তু গোপালের কালাপাড় প্রতি ধোপে আরও কৃষ্ণ বর্ণ হয়, চিক্কণ হয়, এবং তাহার উজ্জ্বলতা বাড়ে। সে পাড় অক্ষয়, অব্যয় এবং নিত্য। আমার কামিনীর একবার ঐরূপ কাপড় পরিতে ইচ্ছা হয়।

বক্‌শীশ লইবে। এখন সে কি মনে করে এই ভাবিয়াই আমি পাগল। যখন আমি ১৪৲ টাকা জলপানি পাইলাম, তখন কলসীকাঁকে, হাস্যমুখী, পাড়ার যুবতীগণ জল আনিতে গিয়া আমার কত গুণগান করিত; বলিত, ইহার স্ত্রী কতই না গহনা কাপড় পরিবে, কতই না সুখে থাকিবে। প্রতিবাসিনী বৃদ্ধারা ভাবিত, এইরূপ ছেলে হলেই মায়ের সুখ; এখন হইতে রোজগার আরম্ভ করিল। না জানি, ইহার পর কত উপার্জ্জন করিবে। আমার এক অতি-বৃদ্ধা পিতামহী বলিতেন, "ভাই! আমার আর কিছুই চাই না, কেবল তুমি শ্রীবৃন্দাবনবাসের খরচটা দিও।"

এখন আমি কাহাকে কি দি, কিছুই ভাবিয়া ঠিক পাই না। এ ভাঙ্গাহাটে, এ বাকীপড়া-শিকস্তি মহলে কি আছে যে, অপরকে দিব? আমি নিজের জন্য বেশী দুঃখিত নহি, কিন্তু অনেকের যে আশা ভঙ্গ করিলাম, এই দারুণ দুঃখে আমার জীবনের মূলগ্রন্থী পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হে ভগবন! কি পাপে বাঙ্গালির ছেলের এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এ দুর্ভর দুঃখ! কই, আমিত কখন কাহারও ধার করিয়া খাই নাই? অসৎকর্ম্ম করিয়া কাহারও মনে ব্যথা দিই নাই? 'আপনি' কই কাহাকে কখন 'তুমি' বলি নাই। উচ্চচক্ষে কখন কোন যুবতীর পানে চাহি নাই। নিরীহ ভাল মানুষটীর মত পাড়ায় থাকিতাম, এবং নিজ পাঠে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিতাম। কিছু কম চৌদ্দ বৎসর নারীর মুখ না দেখিয়া, একরূপ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া, রাত্রে না ঘুমাইয়া, বহুকষ্টে, বহুপরিশ্রমে, বহুযত্নে "এম্ এ" উপাধি লাভ করিলাম; তবুও চাকরি হইল

না,—এক পয়সাও উপায় করিতে পারিলাম না। প্রণয়িনীর অলঙ্কার দূরে যাউক, এখন খাই কি? অন্ন-চিন্তা-চমৎকার, এ জর্জ্জরিত দেহে একাধিপত্য লাভ করিতেছে। ইহা ব্যতীত, বাবা আজ কাল এক খানা ফর্দ্দ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—তিনি বলেন, আমার নন্দদুলালকে লেখা পড়া শিখাইতে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। তাই বলি, আমার একটি চাকরি চাই। তোমরা যে কায করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব। অগো পাড়াপড়শীরা, কেউ আমাকে চাকরি দেবে কি গা?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার আর চলে না। মুখে অন্ন রুচে না। বাপের ভাত খাইতে লজ্জা করে। পঁচিশ বৎসর হইল, এক পয়সাও আনিতে পারিলাম না। লোকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। কোথা চাকরি পাই, কোথা চাকরি পাই, এই চিন্তানলে শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। দিন আর যায় না। এক দিবস এক জন বন্ধু উপদেশ দিলেন, তুমি "এডুকেশন গেজেট" দেখিতে আরম্ভ কর—তাহাতে অনেক চাকরি খালির বিজ্ঞাপন থাকে; তাহাই করিলাম। দেখিলাম, ৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া রোক ৪৫৲ টাকা অবধি, অনেক চাকরি প্রতি সপ্তাহে খালি হয়। মনে বড় ক্ষোভ হইল। ধারণা ছিল, এত 'পাস' করিয়াছি, নিদান পক্ষে ১০০৲ টাকার কম মাহিনার চাকরি কখনই করিব না। পিতা মাতার যে কি ধারণা ছিল, তাহা

বলিয়া আর এখন লোক হাসাইব না। কিন্তু গতি নাই— 'দারিদ্র্য দোষ গুণরাশি নাশী।' দরখাস্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবে না, পৌণে পাঁচ টাকার টিকিট খরচ করিলাম। চাকরি হওয়া দূরে থাক, একখানা পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পাইলাম না। মনে মনে বড় সন্দেহ হইল— ব্যাপারটা কি ? গেজেটের এসব ভৌতিক কাণ্ড নাকি ? বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, বিজ্ঞাপিত চাকরিগুলি অনেক সময়ে খালি হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বেই লোক বাহাল হইয়া যায়।

তখন আবার মনে বড় ভাবনা উপস্থিত হইল। কি করি! একজন বৃদ্ধের পরামর্শ অনুসারে, বাস্তচক্রের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। ক্রমে তাঁহার নিকট বড় আশা পাইলাম। ছয়মাস আনাগোনা করিয়া একজোড়া জুতা ছিঁড়িলে, শীতলগ্রামে গবর্ণমেন্ট-সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ৬০৲ টাকা মাহিনার প্রধান শিক্ষকের পদ একটি খালি হইল। ছয়মাস আনাগোনা, তোষামোদ এবং তদুপরি দুইজনার অনুরোধ—এই ত্র্যহস্পর্শ একত্র হইলে, ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় সদয় হইয়া আমাকে বাহালি পরওয়ানা দিলেন। নন্দদুলাল জয়চাঁদের সে দিবস কি আনন্দের দিন! বিদ্যাশিক্ষার প্রথম ফল, মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীপুত্রদ্বারা সম্মানিত হইবার একমাত্র অদ্বিতীয় উপায়,—অর্থোপার্জ্জনের দ্বার অদ্য মুক্ত হইল।

বাহালি পরওয়ানা হাতে করিয়া, আহ্লাদে আটখানা হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করত একেবারে কামিনীর চরণপ্রান্তে তাহা ফেলিলাম; বলিলাম "প্রিয়ে, গহনার ফর্দ্দ দাও. আর চটাতে

অভাব মোচন হইল।" কামিনী তামাসা বিবেচনা করিয়া, কিম্বা অর্থহীন হইলে, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয় মনে মনে ভাবিয়া, আমাকে পাগল ঠিক করত বিরক্ত ভাবে তথা হইতে উঠিয়া গেল। আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম। ভাবিলাম, একি? ইহাকেই বলে 'হরিষে, বিষাদ'। এই আপোপ্লেক্সি-রোগে পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যু হয়। আমি ত কোন্ কীটাণুকীট! সকল চিন্তা দূরে গিয়া আমার মরিবার বড় ভয় হইল। হায়রে " * * * অমৃতে উঠিল হলাহল! একটু কাঁদিলাম। মনকে দৃঢ় করিলাম। ধমনীতে আর্য্যশোণিত বহিতে লাগিল। বুঝিলাম, কামিনী আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, এরূপ করিয়াছে—অতএব দণ্ডার্হা নহে। অবশেষে স্থিরচিত্তে, গম্ভীর প্রকৃতিতে বাটীর প্রত্যেক পরিজনকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম যে, আমার চাকরি হইয়াছে। সে দিবস মদীয় ভবনে আর আনন্দের অবধি রহিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে, উন্নত-ললাটে প্রভাতচন্দ্রবৎ দধির ফোঁটা পরাইয়া, মাতাকে প্রণাম করিয়া, প্রণয়িনীর সহিত কেবল মাত্র নয়নে নয়নে হানাহানি করিয়া, যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে,—প্রায় দুই ঘণ্টা। ইত্যবসরে একটী ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হইল। ক্রমে তিনি জানিলেন যে, আমি শীতলগ্রামের প্রধান শিক্ষক। তখন তিনি গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে, বলিলেন, "মহাশয়! এমন কায আপনি কদাচ করিবেন না,— এ হতভাগা তিন মাস কাল, ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শেষে

আসিবার সময়, মুদী, উঠনার বাকীর দরুণ, চিরসঞ্চিত, দরিদ্রের কাঞ্চন—কতকগুলি পুস্তক আটক করিয়া রাখে।" অনেক কথাবার্ত্তার পর, শেষে সমস্ত রহস্য অবগত হইলাম। বলিলাম, আমি এই পথেই গৃহ প্রস্থান করিব।

ভদ্র লোকটির নাম রসিকদাস,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিএ'। তাঁহারও যে দশা, আমারও সে দশা। দুজনে বড় মাখামাখি আলাপ হইল। একবার কোলাকুলি করিয়া দুজনে খানিক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। কল্কেতে অগ্নি ছিল, তাহার সাক্ষাতে, পরস্পরে বলিলাম, তুমি আমার সাঙ্গাত, আমি তোমার সাঙ্গাত।

খিড়কীর দ্বার দিয়া বাটী আসিয়া একবার ভাবিলাম, আর চাকরি করিব না। কিন্তু না করিয়াই বা কি করি? স্থির করিলাম, এবার ছোট পায়া ধরিব না, চাকরির খনি "ডাইরেক্টরের" নিকট যাইব। ৩।৪ বার আনাগোনা করাতে দয়ালু বদান্য উড়ো সাহেব বলিলেন, "তোমার যদি খরচের বেশী আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি পকেট হইতে ৫৲ টাকা দিতেছি, গ্রহণ কর। আর যত দিন না তোমার চাকরি করিয়া দিতে পারি, তত দিন তোমাকে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া দিব। তুমি মাসে মাসে একবার করিয়া আসিও।" আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম। অভিমানে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম এ কি?—ভিক্ষুক তৃণ অপেক্ষা লঘু। শেষে কি ভিক্ষা ব্যবসায় হইবে? এ জীবনকে ধিক্! মাতঃ বসুন্ধরে দ্বিধা বিভক্ত হও, আমি তাহাতে প্রবেশ করিব। ইহজগতে, এ জনমদুঃখীর আর শান্তিস্থল কোথাও দেখিতেছি না।

পরিশেষে সাহেব মহোদয়কে বুঝাইয়া বলিলাম "আমার টাকার আবশ্যক নাই; চাকরি খালি হইলে দিবেন।" ইহা বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম। শীঘ্রই উড্রো সাহেবের মৃত্যু হইল—আমিও বাঁচিলাম। তার পর ডাইরেক্টরী আফিসে দখল পাইলাম না।

দেখিলাম সকল দিক্ বন্ধ। কি করি, কোথায় যাই। বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, পরাধীনতা বড় কষ্ট। পরের তোষামোদ করিব না। স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিব। স্বাধীন ব্যবসায় কি?—ওকালতী। ওকালতীতে বড় মজা। যে দিন ইচ্ছা শ্বশুরবাড়ী যাও—দুই দিন কামাই করিলেও কেহ কৈফিয়ত তলব করিবে না—না হয় দশ টাকা ক্ষতি—তাহা পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু উকীল হইতে হইলে, কলেজে আবার ভর্ত্তি হইয়া মাহিনা দিয়া দুই বৎসর পড়িতে হইবে। বাবার নিকট হইতে টাকা চাহিতে লজ্জা করে; এবং চাহিলেও যে তিনি আর দেন, এমত বোধ হয় না। নিতান্ত মুখ-নষ্ট করা মাত্র।

স্থির করিলাম, ভারতবর্ষের প্রধান নগর কলিকাতায় যাইয়া একবার অদৃষ্ট-পরীক্ষা করিব। এবং তথায় যদি কোন সুবিধা করিতে পারি, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আইন পড়িব। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে রসিকদাস, বি, এ সাঙ্গাতের সহিত দেখা হইল। দেখিলাম, তিনি চাকরির জন্য ঘুরিতেছেন। প্রত্যহ দশটার সময়, বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে উত্তমরূপ আহার করিয়া, চাকরির অন্বেষণে বহির্গত হন—সন্ধ্যা বেলা শুষ্কমুখে এক পা ধূলার সহিত ক্ষুধায় আকুল

হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে সিকি-পেটা জল-খাবার খাইয়া, ভারতমাতার উন্নতির জন্য ব্যতিব্যস্ত হন। বিশেষ পরিচয়ে জানিলাম, এখানেও আমার যে দশা, সাঙ্গাতেরও সেই দশা। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন-বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন—এবং যাহাতে বাসা খরচ বাটী হইতে আনিতে না হয়, এই জন্য একটী চাকরির চেষ্টা করিতেছেন। আমি বলিলাম "সাঙ্গাত ভাই! তুমি আমারও জন্য একটা চাকরির অন্বেষণ করিও,—আমি কিছু কাহিল আছি, আজকাল বাজারে বাহির হইতে পারিব না।"

এইরূপে দুই জনে কিছু দিন কলিকাতার শোভা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গলি ঘুঁজি সদর রাস্তা সকল প্রকার পথ নখদর্পণে দেখিতে লাগিলাম। তবু কেহ ডাকিল না। শেষে বোধ হইল যে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাড়ী পাক পাইয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইতেছে। মন বড়ই খারাপ হইল। চাকরি চাকরি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইব নাকি? আইন পড়িব কি না, এই দারুণ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইল—কারণ, দেখিতেছি, উকীল হওয়া ভিন্ন, চাকরির অন্যতর উপায় নাই। কিন্তু টাকা কোথায়? ভাবিলাম পিতার নিকট গিয়া পায়ে ধরিয়া বলিব, "পিতঃ! আমাকে আর দুই বৎসর কাল পড়ান, তৎপরে উকীল হইয়া সকল দুঃখ মোচন করিব।" ইহাতেই কৃতসঙ্কল্প হইলাম, সাঙ্গাতও মত দিলেন।

সেই দিবস বৈকালে গঙ্গার ধারে দুই সাঙ্গাতে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ঈশগান গাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। দেখিতে

দেখিতে সন্ধ্যা সমাগতা। ক্রমে একটু রাত হইল। আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বাসার দিকে ধাবমান হইলাম। দেখিলাম নগর আলোকময়। পথের জনতা তখনও ঘুচে নাই—সমস্ত লোকই নিজ নিজ কার্য্যে বিব্রত। দেখিলে বোধ হয় যেন চারিদিকেই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বিরাজিত। কেবল এ অভাগা লক্ষ্মীছাড়াদের এখানে কোন কায নাই। আমরা কলিকাতায় এক-ঘরে।

মনোভ্রমে পথ ভুলিয়া, ক্রমে এক অন্ধকারময়, অপ্রশস্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট গলিতে গিয়া পড়িলাম। যতই অগ্রসর হই, ততই তিমিররাশি আরও গাঢ়তর হইয়া গায়ে যেন বাজিতে লাগিল। ক্রমশঃ মনুষ্যের সমাগত বন্ধ হইল। বড় ভয় হইল। ইহাই কি নরক গমনের পথ? অর্দ্ধক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, দূর হইতে একটী আলোক দৃষ্ট হইল। সাহস পাইয়া দ্রুতপদে তদভিমুখে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম সম্মুখে একটি বৃহৎ উদ্যান। ফটকে একটি আলো জ্বলিতেছে; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। অনুভবে জানিলাম, ভিতরের দিক হইতে অর্গল-বদ্ধ। "নিরাশ্রয় পথিকদ্বয়, বিপদে পড়িয়াছি, দ্বার খুলিয়া দাও," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম; কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল,—ব্যাপারটা কি? অবশ্যই ইহার ভিতর লোক আছে। বাগানের প্রাচীর অতিশয় উচ্চ ছিল। সাঙ্গাত আমার স্কন্ধে চাপিয়া বহুকষ্টে তদুপরি উঠিলেন। দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় মিট মিট করিয়া একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। কিন্তু মনুষ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না—নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিকে বিরাজ

করিতেছে। অবশেষে পর্য্যালোচনা দ্বারা বোধ হইল যে, উদ্যানের প্রান্তভাগে, অর্দ্ধক্রোশ দূরে, ঈশান কোণে, একটা অগ্নি জ্বলিতেছে। ক্রমে ক্রমে সে অনল বর্দ্ধিতায়াতন হইল; শবদাহের কাণ্ড বলিয়া বোধ হইল। সেই বিজন উদ্যানে অন্ধকার মধ্যে প্রাচীরে দণ্ডায়মান দুই জনে—একলা। সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, অতি কষ্টে বহু পরিশ্রমে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া, সেই প্রজ্বলিত বহ্নির দিকে ধাবমান হইলাম। নিকটে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব, অননুভূত এবং মানববুদ্ধির অগোচর।

দেখিলাম, অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ, শ্বেত প্রস্তরে গ্রথিত চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ পরিসর বেদীর উপর দুই অঙ্গুলি ঘন বালির রাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। তদুপরি স্তূপাকার চন্দনকাষ্ঠ সাজান। মধ্যে মধ্যে ধূপ, ধূনা, গুগ্গুলের সমাবেশ। তদুপরি সদ্যোজাত-মাখম-গলান, সুগন্ধ-যুক্ত, গাওয়া ঘৃত, অকাতরে গড়াইতেছে। তদুপরি শব। এ শব, মনুষ্য নহে, পশু নহে, পক্ষী নহে, পৃথিবীর প্রাণবিশিষ্ট কোন জীবই নহে। ইহা অচেতন পদার্থ—রাশীকৃত বিবিধবর্ণের বিবিধ-আকারযুক্ত পুস্তক। তদুপরি আবার ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেখিলাম, কেবল একজন মাত্র, ক্ষীণাঙ্গ, গোঁফদাড়িবিশিষ্ট যুবা পুরুষ এসমস্ত কার্য্যের পরি-দর্শন করিতেছেন। তাঁহার পরিধান পেণ্টুলন, চাপকান্ এবং তদুপরি রেশমি চোগা। মাথায় শালের পাগড়ী। দক্ষিণ হস্তে দুই খণ্ড কাগজ।

সেই জন-শূন্য প্রদেশে, অমাবস্যার রাত্রে একটি তেঁতুল বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আমরা দুই জনে সেই ভৌতিক কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন নিম্নদেশের চন্দনকাষ্ঠ ধরিয়া কেবল দুই একখানি পুস্তক পুড়িয়াছে মাত্র। যুবা পুরুষ আবার এক কলস ঘৃত ঢালিয়া দিলেন, এবং এক সের আন্দাজ ধূনা ছড়াইয়া দিলেন। অগ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রফুল্ল-চিত্তে সেই বেদীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সপ্তমবারে, দক্ষিণ হস্তস্থিত দুই খণ্ড কাগজ, বক্ষে স্থাপন করিয়া, সেই প্রদীপ্ত বৈশ্বানর-মুখে ঝম্প দিবার উপক্রম করিলেন। আমি আর থাকিতে না পারিয়া, দ্রুতগতি গিয়া তাঁহাকে ধরিলাম। তিনি, 'কে তুমি' বলিয়াই অচেতন-প্রায় হইলেন। আমি আস্তে আস্তে ধরিয়া তাঁহাকে আমার কোলে শয়ন করাইলাম। সাঙ্গাতকে বলিলাম, "ভাই শীঘ্র একটু জল আনয়ন কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে সেই ভূ-লুণ্ঠিত মৃতপ্রায় অবসন্ন দেহ হইতে বস্ত্রাদি খুলিতে লাগিলাম। সাঙ্গাত আসিয়া তাঁহার চক্ষে ও মুখে জল দিলেন। তালবৃন্তের অভাবে আমি; আমার শতধা ছিন্ন চাদরের দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিনি চক্ষু মেলিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আপনারা কে?" আমি বলিলাম, "মহাশয় স্থির হউন, কথা কহিবেন না।" তখন তিনি

তীব্রস্বরে ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আপনারা অতিশয় নিষ্ঠুর; যাহা করিবার নয়, তাহাই করিলেন। আর কেন, আমাকে ঐ গৃহে লইয়া চলুন।"

আমরা দুইজনে ধরাধরি করিয়া, তাহাকে সেই উদ্যান মধ্যস্থিত অট্টালিকার ভিতর লইয়া গেলাম। একটি ঔষধপাত্রে ব্রাণ্ডি আছে বলিয়া বোধ হইল। কিঞ্চিৎ তাঁহাকে সেবন করাইলাম। তিনি সেবনান্তে, ক্রমে একটু বল পাইলেন—মনেও স্ফূর্ত্তি হইল। তখন আস্তে আস্তে দুই একটি কথা কহিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম "মহাশয়! পথ ভুলিয়া এদিকে আসিয়া পড়িয়াছি।" "আপনি কে? জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত হইলেন; মৃদুস্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন,—আমার আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছা নাই—আর এ অভাগার পরিচয় লইয়াই বা কি ফল?" আমাদের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে, পুনঃপুনঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

তখন তিনি পালঙ্কোপরি বীরাসনে উপবেশন করিয়া মুদ্রিত-নয়নে এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমার নাম শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ। পিতার নাম ৺ গৌরহরি ঘোষ। নিবাস কলিকাতা। বয়স ২৯ বৎসর, ৩ মাস। জাতি কায়স্থ—মুখ্য কুলীন। পেশা—নাই। পিতার আমি একমাত্র পুত্র। আমার ২টি মাত্র কন্যা সন্তান।

'৺পিতা আমার সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঢের টাকা উপার্জ্জন করেন, ঢের টাকা ব্যয়ও করেন। আমি আদরের পুত্র ছিলাম—যখন দুধ, সর, চাঁচি ও মাছের মুড়ার কেহ অংশীদার থাকে

নাই। পিতা মাতার স্নেহে, যত্নে এবং ভালবাসায় লালিত হইতে লাগিলাম। বিদ্যালয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলাম; শিক্ষক বলিলেন 'এমন ছেলের যোড়া নাই।' কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের সমস্ত ভার আমার উপর পড়িল। পিতার অনেক বন্ধু বান্ধবে আমাকে চাকরি করিতে বলিলেন, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া পড়িতে লাগিলাম। পৈতৃক ধন বিনষ্ট করিয়া, এ ভারতে ইংরেজরাজত্বে যে কয়টি পাশ করিতে হয়, তাহাই করিলাম। যে বৎসর 'ষ্টুডেণ্টশিপ্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সে বৎসর কলিকাতায় সাহিত্যচক্রে আমার নামে একটা ঢি ঢি উঠে। আমি সাত পাঁচ না ভাবিয়া, মনে করিলাম, আমি একটা কি হইলাম,—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পাইব, কি স্বর্গ হইতে সুধালোলুপ দানবগণকে তাড়াইব, কি মরা মানুষকে জীবন্ত করিব?

কিছু দিন পরে, উকীল হইয়া হাইকোর্টে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যহ, আদালতের বাহার, জজের বাহার, জনতা, গোলমাল, সাহেবের বক্তৃতা, বাঙ্গালির বক্তৃতা দেখিয়া শুনিয়াই মনকে সন্তুষ্ট করত শুষ্কমুখে গৃহে প্রত্যাগমন করি। একদিনও কেহ কথা দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল না, 'আপনি কি করিতে এখানে আসেন।" প্রত্যহ আমার মত উদরে অন্ন নাই, বাহিরে চিকণ—কতকগুলি উকীলের সহিত এয়ারকি দেওয়াই আমার কায হইল। কিন্তু এমন করিলেও ঘর চলে না এবং দিনও যায় না। কদাচ, ছয় মাসে, নয় মাসে, অনুগ্রহে উপরোধে দুই একটি মোকদ্দমা পাইতাম—কিন্তু পয়সা একটী কখনও পাই নাই। পৈতৃক ধনে লেখা পড়া শিখিয়াছি, এক্ষণে

পৈতৃক ধনেই চাকরি করিতেছি। পৃথিবীতে এ রহস্য বুঝিবার লোক কয় জন আছেন ?

"একদা কোন স্থানে (নাম করিবার আবশ্যক নাই,) ১০০৲ টাকা মাহিনার একটি চাকরি খালি হয়। ২৪৯ খানি দরখাস্ত পড়ে। মন্দভাগ্য আমিও নিরুপায় ভাবিয়া এক খানা দরখাস্ত করিয়াছিলাম। প্রধান সাহেব, সিংহাসনারূঢ় হইয়া সকলের সমক্ষে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এ কাযের প্রধান যোগ্য পাত্র; তোমাকে রাখিয়া আমি এ কায কাহাকেও দিতে পারি না; কিন্তু দিব না। তুমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত আছ, তাহার গৌরব, তাহার মর্য্যাদা, তাহার সম্ভ্রম অলৌকিক—এ লোক-জগতে দুর্লভ; এমন কি, অনেক সময় আমারই ইচ্ছা হয় যে, তোমাদের ও-জগন্মান্য, মহামূল্য পদের সহিত, আমার এ অকিঞ্চিৎকর পদ বিনিময় করি। হে মুগ্ধ! এ সামান্য মূল্যের চাকরির জন্য, সেই দেবদুর্লভ বৃত্তি ত্যাগ করিলে, তোমার কলঙ্ক, তোমার দেশেরও কলঙ্ক, তোমাদের সমস্ত জাতির উপর কলঙ্ক হইবে,—অতএব আমি দিতে ইচ্ছা করি না,—কি বল ?" আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, সাহেবকে সেলাম করিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। মনে একটা কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাতে তখন চক্ষে ভাল দেখিতে পাই নাই- তজ্জন্য দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া যাই। এক ঘর লোক—সকলেই খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল—শুনিলাম, বড়সাহেবও ঈষৎ মুচকি হাসিয়াছিলেন।

"পসার না হইবার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অনেকে বলিল যে, আমি আইন জানি না। অনেকে

আমার মুখচোরা অপবাদ দিল। অনেকে আমাকে বিলাসী ও বাবু বলিল। এইরূপ কিছু দিন গোলমালে যায়—কিছুই ঠিক হয় না; শেষে সকলে একমতাবলম্বী হইয়া বলিলেন যে, আইনের কূটতর্কে আমার ক্ষমতা নাই, নচেৎ অপর দিকে আমি মন্দ নহি। আমার আবশ্যক মত গৃহস্থঘরে যেরূপ থাকিতে হয়, সেইরূপ কতকগুলি আইন পুস্তক ছিল। কিন্তু আমার বন্ধু বান্ধবের তাহাতে মন উঠিল না। তাঁহারা আমাকে রাশীকৃত আইন পুস্তক খরিদ করাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

এমন সময়, কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অতিবৃদ্ধ সাহেব-বারিষ্টর বিলাত যাইবে বলিয়া জনরব উঠিল। তিনি সমস্ত আইন নিলাম করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। আমি সঙ্গে নগদ টাকা লইয়া, কতকগুলি বন্ধু-পরিবেষ্টিত হইয়া নিলামের স্থানে উপস্থিত হইলাম। দুই হাজার সাত শত টাকার পুস্তক কিনিলাম। লোকে বলিল, দশ পনর হাজার টাকার পুস্তক পাইয়াছি।

"স্ত্রীকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দিয়া, তিন বৎসর কাল, সেই সমস্ত আইন বহুপরিশ্রমের সহিত, কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া পড়িলাম। তথাচ পসার হইল না। এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে, মাথা ঘোরার ব্যারামটা কিছু বৃদ্ধি হইল।

"ক্রমে পুস্তক পড়িতে আর ভাল লাগিত না। এমন কি, দেখিলেই বিরক্ত বোধ হইত। কখন কখন পুস্তক গৃহে প্রবেশ করিয়া আলমারি-ভরা বই দেখিয়া কাঁদিতাম। কখন বা ক্রোধে বলিতাম, রে দুশ্চরিত্র পুস্তক সকল! তোরা নিতান্ত অপদার্থ

রোগ, শোক প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রেরিত তপোবিঘ্নকারী দৈত্যগণকে পরাস্ত করিয়া, ঐকান্তিক মনে তোদের সেবা করিলাম, তথাচ তোরা সদয় হইলি না। তোরা নেহাইত বেইমান্‌। তোদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।"

"ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। স্মরণশক্তি কমিয়া তোদের কোন গুণ নাই—অসার। আমি পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আজ পর্য্যন্ত, তোদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম—তবুও নিষ্ঠুর! তোরা সুফল প্রদান করিলি না। রৌদ্র, শিশির, শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, তুফান, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, গেল। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মানসিক-বৃত্তি সমস্তই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ভবলীলা সাঙ্গ হইল নাকি? মনে হইল, সত্য সত্যই শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত। তবে বৃথা আর এ দেহভার বহন করি কেন?—আমি মরি না কেন? মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—স্থিরসঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু ইহজীবনে যাহারা একমাত্র অবলম্বন ছিল,—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, নির্জ্জনে, লোকালয়ে, গৃহে, অরণ্যে, যাহাদের সহিত এক দণ্ডও বিচ্ছেদ ঘটে নাই—যাহারা আমার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, অন্তরের ভিতর অন্তরে মিশাইয়া আছে, তাহাদিগকে আমার এ অন্তিমকালে কোথায় ফেলিয়া যাইব? যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, আমার অবর্ত্তমানে তাহাদের থাকিয়া ফল কি, কিম্বা তাহাদের অবর্ত্তমানে আমার বাঁচিয়া ফল কি? অতএব আমি তাহাদের সহিত সহমৃত হইব। তদনুযায়ী, আমার নিজ পুস্তকালয় হইতে, সমস্ত পুস্তক লইয়া, এই নিভৃত উদ্যানে 'শ' সাজাইলাম। 'শ' সাতবার প্রদক্ষিণ

করিয়া যেমন তন্মধ্যে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছি, আপনি আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ধরিলেন। যে দুই খণ্ড কাগজ আমার হস্তে ছিল, তন্মধ্যে একখানি 'ষ্টুডেণ্টশিপ' পাশের রসিদ, অপরখানি বি, এল, পাশের রসিদ। সহমরণ কালে, এই দুই খণ্ডকেও ভস্মীভূত করিবার নিতান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু আপনারা আমাকে বাধা দিলেন।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। ঘোরতর অন্ধকার। আমরা তখন আর বাসায় গমন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। সেই উদ্যান মধ্যস্থিত অট্টালিকায়, দ্বিতলে কোন এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে, আমরা তিনজনে এক শয্যায়, এক মশারির ভিতর, এক বালিসে, এক লেপে শয়ন করিয়া গল্প করিতে করিতে সুখে নিদ্রা গেলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমরা কার্ত্তিক বাবুকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া, আমাদিগকে ধন্য বলিয়া মানিলাম। স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া কার্ত্তিক বাবুও বিশেষ অনুতাপ করিতে লাগিলেন—"কি করিতেছিলাম?—কাযটা বড়ই মন্দ হইতেছিল—লোকে শুনিয়াই বা কি বলিবে?" শেষে আমাদিগের নিকট হইতে উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কার্ত্তিক বাবু বড় সৎ লোক। নিতান্ত অমায়িক। সেই টুকটুকে মুখখানিতে মৃদুমন্দ হাসিয়া হাসিয়া বাক্য নিঃসরণ, কতই মধুর। তাঁহার কথাবার্ত্তা—গল্প, শ্রোতার মনোমোহন-

কারী। সেই সুতীক্ষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় চাহিয়া তিনি যখন যাহার উপর ক্রোধ বা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, সে ব্যক্তি অমনি তাঁহার বশ হইত। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। তিনি আমাদিগকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। আমরাও তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতাম না। কার্ত্তিক বাবুর পিতার আমলের একখানি ঘোড়ার গাড়ি ছিল; আপাততঃ অশ্বটী কিছু কাহিল। আমরা তিনী জনে, প্রত্যহ বৈকালে, শকটারোহণে, সহরময় বেড়াইতাম। মাসের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে আমাদের চর্ব্ব্য-চূষ্য-পেয় রূপে ৮২ সিক্কার ওজনে আহারটা হইত। কার্ত্তিক বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন যে, আমি আপনাদের সহিত মিলিয়া, আছি ভাল,—আমার অন্তর্দাহ একরূপ রোগ জন্মিয়াছিল, সেটা এখন অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। কার্ত্তিক বাবুর পরামর্শে, সাক্ষাত প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-বিভাগ হইতে নাম কাটাইলেন। আমি, আইন শিক্ষার্থে কলেজে ভর্ত্তি হইতে ক্ষান্ত হইলাম—এ দগ্ধ অদৃষ্টে সে সাধ পূরিল না। তিনজনে একত্র হইয়া কেবল মুখামুখি করিয়া বসিয়া গল্প করিতাম। গল্প করিতে করিতে কখন হাসিতাম, কখন কাঁদিতাম, কখন ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতাম, কখন বা গম্ভীর স্বর অথচ ধীরে ধীরে এক জন বলিত, দুইজনে শুনিত, কখন বা সকলেই এককালে চীৎকার করিয়া উঠিত। কখন বা একজনের বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধে দুইজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু একজনই উভয় যোদ্ধাকে পরাভূত করিয়াছে। ক্রমে আমার বক্তৃতা শক্তি কিছু স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে লাগিল। যথা;—

"ইহ জগতে জগদীশ্বরের প্রধানতম জীব, মনুষ্য। মনুষ্য নিজ বুদ্ধিবলে পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত জীবের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে; সকলকে পদতলে রাখিয়াছে; সকলের উপর হুকুম চালাইতেছে। অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, এ সুদুর্ল্লভ মানব-দেহ ধারণ করিয়াছি। এমন জনম আর পাইব না। এ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যদি মনুষ্য জীবন বিফলে যায়, তাহা হইলে, অনন্তকাল নরকে পচিতে হইবে।

"দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পাপ কলিকালে মনুষ্য অন্নজীবী। আহার না পাইলে, দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। কিন্তু পরমেশ্বরের রচনা এরূপ কৌশলময়ী; যে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য মানবজাতির চারি দিকে বিদ্যমান; দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্মুখে তপ্তকাঞ্চননিভ ব্রহ্ম-মূর্ত্তি, রসগোল্লা বর্ত্তমান; কিন্তু হস্ত বাতে পঙ্গু, নাড়িবার শক্তি নাই। আমার মনের সাধ মনেই মিলাইয়া গেল। ঐ দেখ, কোন নবাবপুত্রের— কোমরে গেট,—সিঁথাকাটা,—গায়ে পিরিহান—লম্বাকোঁচা,— কাকপক্ষবিশিষ্ট চাকর আসিয়া, ঠনাৎ করিয়া ১ টাকা ফেলিয়া দিয়া দুই সের রসগোল্লা নির্ব্বিঘ্নে লইয়া চলিয়া গেল। আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। আফসোসে, দুঃখে বক্ষ ভাঙ্গিয়া গেল। ডাহিনা বামে, বলবীর্য্য-রূপগুণবুদ্ধি-বিবেচনা,—আয়ুযশোদাতা মাংসের কালিয়া। পঙ্গু আমি, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন করিয়াই রসনাকে পরিতৃপ্ত হইতে বলি; রসনা, তাহাতে কেঁদে কেঁদে পৃথিবীকে ভিজাইয়া কান্না করে। আবার দেখ, ঐ সাদাপাগড়ী মাথায়, পেণ্টুলন চাপকান-পরা, দিল্লীর

নাগরা জুতা পায়ে, কোমরে চাদর বান্ধা, শ্বেতকায় পুরুষের চাকর সমাংস ঝোলটুকু সমগ্র লইয়া যায়! সাঙ্গাত ধরছে, পলায় যে? সাঙ্গাত বলেন, ভাই! আমারও হাতে ঐ বাত ধরিয়াছে।" বাস্তবিক এজন্মটা আমরা শারীরিক ও মানসিক বাতে মারা গেলাম।' কার্ত্তিকবাবু ঈষৎ মুখ টিপিয়া হাসিলেন। "কার্ত্তিক বাবু এ হাসিবার কথা নহে। আপনার হাসি অপর সকল সময় ভাল লাগে, কিন্তু এ সময় সহ্য হয় না। দেখুন এ পঙ্গুবাতের প্রতীকার না করিলে, ভারতের বার আনা লোক অনাহারে মরিবে; দুঃখে শৃগাল কুক্কুর পর্য্যন্ত কাঁদিবে, ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে করিয়া, 'হা অন্ন, হা অন্ন' বলিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইলেও, মুষ্টি পর্য্যন্ত মিলিবে না। আমাদের এরূপ সময় উপস্থিত হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। মানব দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া যদি অঙ্কুরেই আহারাভাবে মর, সন্তান সন্ততিকে দুগ্ধ বিনা বাঁচাইয়া রাখিতে না পার, তাহা হইলে কৃমিদেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল রৌরবে বাস করা সহস্রগুণে ভাল। মনুষ্য জীবন যদি সার্থক করিতে না পারিলে, তবে বাঁচিয়া ফল কি? সার্থক করা দূরে থাকুক, যদি আহারাভাবে পশু দেহেরই ভার বহন করিতে না পার, তাহারি যে কি দণ্ড তাহা জানি না।"

দেখিলাম কার্ত্তিক বাবুর গণ্ডস্থল বহিয়া বারিধারা পতিত হইতেছে। রুমাল দিয়া মুখ পুঁছিয়া অতি ধীরে বলিলেন, "আমি বড় দুঃখেই হাসিয়াছিলাম, যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করিবেন।"

সাঙ্গাত বলিলেন "তোমরা দুজনে আজ যে চেনহাইত

বাড়াবাড়ি করিলে দেখিতেছি। মিছা ভাবনা ভাবিয়া, মিছা গোল করিবার আবশ্যক কি? এ ভারতে কেহ আর খাইতেছে না, পরিতেছে না, নয়? পরমেশ্বর যখন জীবন দিয়াছেন, তখন অবশ্যই আহার যোগাইবেন। নচেৎ বিধির সৃষ্টি লুপ্ত হইবে। আর যদি বল, ওকালতীতে এখন সুখ নাই, সে কথা আমি মানি না। সত্য বটে, রাজধানীর নিকট কতকগুলি জেলায়, উকীলের কিছু ঘেঁসাঘেঁসি হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধির বিচক্ষণতা থাকিলে সেখানেও পসার করা যায়। আর যাহাদের সরল বুদ্ধি, তাঁহাদের জন্যও অনেক দ্বার খোলা আছে—জলপাইগুড়ি যাও, রাঁচি যাও, কটক যাও, কিম্বা একটু বেশী পশ্চিম পানে ঠেলিয়া যাও—সেখানে এখন তত উকীল নাই, গমন মাত্র পসার। অতএব ও পদ আপনারা যেরূপ ঘৃণ্য বিবেচনা করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আর যদি মনে করিয়া থাকেন, যে আমাদের চাকরি হইবে না, (যদি সত্য সত্যই এ কথা আপনাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে) তাহা হইলে, আপনারা নিতান্তই ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছেন। চাকরির অভাব কি? ব্রজমাধব, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এখন কণ্টোলার আফিসে তাহার ১৫০৲ টাকা মাহিনা—বৃদ্ধিরও বেশ সম্ভাবনা আছে। আমাদের নিতাই—নেহাইত ঢেরাকাটা—কলিকাতায় একমাস ঘুরিয়াই ৫০৲ টাকার এক চাকরি বাগাইয়াছে। ঘোষেদের দিনু এল, এ, পরীক্ষায় দুইবার ফেল হয়, তার যদি এখন ধুমধাম—চেরেট বগি দেখ, তাহা হইলে অবাক্ হইতে হয়। তারিণী বা. ভারি গবাগণ্ড ছিল—শিক্ষক প্রতিদিন দুইবেলা কাণ মলিয়া বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিতেন, উপরি উপরি

সাতবার ফেল হয়, আমরা কাণামাছি করিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময়ে তার চাকরি হয়। এখন কলিকাতায় এক মস্ত বাড়ি কিনিয়াছে, গাড়ী না হলে পথে চলে না। ভাই কি আর বলিব, সকলি অদৃষ্ট ও চেষ্টা। একবার আমাদের পাড়ার ৩০।৩৫ জন ছেলে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপর্যুপরি ফেল হয়; ঝড়ে যেরূপ কলাগাছ পড়ে, সেইরূপ তাহাদিগকে পাড়িল; একেবারে পাড়াকে-পাড়া সমভূম হইল। তাহাদের আকার প্রকার, বিক্রম, এবং করাল নয়ন দেখিয়া আমার মনে বড় ভয় হইয়াছিল, যদি ইহারা কোন কাযে নিযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে, ইহাদের উপদ্রবে পাড়ায় তিষ্ঠান ভার হইবে। কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, তাহাদের সকলেরই চাকরি হইয়াছে—কাহারও ২৫৲ কাহারও ৩০৲ কাহারও বা ৫০৲ টাকা মাহিনা হইয়াছে—প্রতি শনিবারে কারপেটের এক একটি ব্যাগ হাতে করিয়া বাটী আসিতে দেখি।”

চক্ষু ঘোরাল করিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন, “সাঙ্গাত! চাকরির অভাব কি? ধৈর্য্য ধরুন, অধ্যবসায়শীল হউন, এবং চেষ্টা করুন; অচিরেই চাকরি হইবে। এক মাসে না হয় দুমাসে হইবে, দুমাসে না হয় চারি মাসে হইবে, না হয় দুই বৎসরে হইবে। চেষ্টা থাকিলে, চাকরি হইবেই হইবেই, কেবল দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। কারণ চেষ্টার অসাধ্য কোন কার্য্য আছে কি? দুইটা কথা চাপিয়া বলিতেছি, বলিয়া সাঙ্গাত রাগ করিওনা—কারণ ইহা রাগের কথা নহে। চাকরী ব্যতীত আর অন্য উপায়ই বা কি? —কই আমিত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না। ব্যবসা বাণিজ্য?

কৃষি কর্ম্ম? ভাই! কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গমকর—ব্যবসা করিতে পুঁজি কই? চাস করিতে জমি কই? মনে কর না হয় কোন গতিকে দুই দশ বিঘা জমি পাওয়া গেল—বিশেষ প্রণিধান করিয়া বুঝ—তাহাতে পেট ভরিবে কেন? আর এ বয়েসে, এত লেখা পড়া শিখিয়া এত পাস করিয়া, কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, লাঙ্গলের মুঠ ধরিতে হইবে? ধিক্ ভারতের আর্য্যসন্তানদিগকে ধিক্! যাহা হউক, একটা কথা স্বীকার করি বটে যে, আজকাল চাকরির বাজার কিছু গরম; পূর্ব্বে যেরূপ সহজে চাকরি পাওয়া যাইত, এখন সেরূপ পাওয়া যায় না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সস্তা মহার্ঘ্য আছে, আজ যে চাউলের মণ ২৷৵৹; কল্য সেই চাউলই ৪৲ টাকার কম এক মণ পাওয়া যায় না; এবং পুনরায় দশদিন বাদে সেই চাউলই ২৲ টাকা মণ পাওয়া যাইতে পারে। চাকরীর ঠিক সেইরূপ অবস্থা জানিবেন।

"যাহা হউক, যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আর একটা কথা বলি। ইংলণ্ড গমন করিয়া, লেখা পড়া শিখিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিলে অনেক উন্নতি করা যায়, বিশেষ সম্মান বাড়ে, এবং পয়সাও বেশ পাওয়া যায়। যদিও, আপনাদের মতে, রাজধানীতে উকীলের কিছু সম্মান কমিয়াছে বটে, কিন্তু বারিষ্টার গৌরব কিছুই লাঘব হয় নাই—কারণ উহা লাঘব হইবার জিনিস নহে। যদিও, ওপদ প্রাপ্ত হওয়া কিছু ব্যয়সাধ্য বটে, তথাচ কায়-ক্লেশে একবার ইংলণ্ড গমন করিয়া, বারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে, দেশের অনেক উপকার। আমার ইচ্ছা যে, দেশের

ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, গরিব সন্তানদিগকে, অর্থসাহায্যে বিলাত পাঠান। কার্ত্তিক বাবু চুপ করিয়া রহিলেন যে?—এ সব বিষয়ে কথা কহিতেছেন না যে?"

কার্ত্তিক বাবু মনে মনে হাসিয়া, গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "রসিক বাবু, এ কথায় আমি আর কি উত্তর দিব? আপনি দেখিতে চাহেন, না, শুনিতে চাহেন?" রসিক বাবু চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অনন্ত বক্তৃতা সাগরের ঢেউ আরও বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি মধ্যে পড়িয়া বলিলাম, "সাঙ্গাত ক্ষান্ত হও; যে ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহারই আজ আহার জুটিবে না; আর তুমি যদি প্রত্যহ এরূপ কর, তাহা হইলে, তোমার সহিত আজ অবধি পৃথকান্ন হইলাম; তুমি আলাদিয়া হাঁড়ি কাড়িও। সে যাহা হউক, আপাতত গোলাপী রেউড়ী, চেনাচুর বেচিতে যাইতেছে, দুই পয়সার কিনিব কি?" রেউড়ীর নামে সাঙ্গাত আমার, বক্তৃতা ভুলিয়া গেলেন, স্বদেশানুরাগের বেগ থামিল—আমরাও বাঁচিলাম।

এক দিন সোমবার প্রাতঃকালে, কার্ত্তিক বাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া একটু চা খাইয়া, আমরা তিন মহাপুরুষে তিনখানি "সহজ-কেদারায়" বসিয়া সদালাপ করিতেছি। গার্হস্থ্য রজক দেখা দিল। ইতস্ততঃ চাহিয়া রজক বলিল, "বাবুকে একবার উঠিতে হইবে, একটা গোপনীয় কথা আছে।" কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, 'এখানে অপর কেহ নাই, তুমি বল।" রজক তখন বস্তানি হইতে সাহেব-লোকের পরিধেয় 'কলার' নামক এক টুকরা কাপড় বাহির করিল। বলিল, বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,

হুজুরের যদি পছন্দ হয়, লউন। কার্ত্তিক বাবু চমকিয়া উঠিলেন; অঙ্গ-যষ্টি মধ্যে যেন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত হইল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "দেখ পীতাম্বর! এটি কার বলিতে হইবে।" পীতাম্বর বড় সায়েস্তা ধোবা। হস্তদ্বয় যোড় করিয়া বলিল, হুজুর মা বাপ; এ গোলাম—চাকর; আপনারও চাকর, তাঁহারও চাকর; অতএব গোলামের এ কসুর মাপ করিতে হইবে।" পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে পীতাম্বর লেখা পড়া শেখে নাই; কার্ত্তিক বাবু বাকযুদ্ধে জয়ী হইলেন। পীতাম্বর বলিতে বাধ্য হইল,—"হুজুর! এই কাপড়রত্তিটুকু কাচিতে প্রতিধোপে চারি আনা করিয়া লইয়া থাকি। সাতবার কাচিয়াছি, সিকি পয়সাও পাই নাই। শেষে যাঁহার কাপড়, তিনি বলিলেন, ঐ কাপড় তুমি লইয়া যাও, আমি মূল্য দিতে অক্ষম।" অধিকারীর নাম শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র, পেশা বারিষ্টারি।

রজক বিদায় হইয়া গেলে পর, রসিক বাবু স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, এ কথাই নয়—এটি আমার এবং কার্ত্তিক বাবুর কারসাঁজি। সাঙ্গাতকে আমি ঢের বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই রাগ ফিরাইতে পারিলাম না। কার্ত্তিক বাবু মুখ টিপিয়া টিপিয়া মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে লাগিলেন। এক খানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, "বেয়ারা!" ভৃত্য হাজির হইল। প্রভু ভৃত্যে হিন্দী ভাষায় যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।' কারণ, সে হিন্দী, বেদ-কোরাণ-বাইবেল বিবর্জ্জিত

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র "বারিষ্টার-অ্যাট-ল"

আসিয়া উপস্থিত। কার্ত্তিক বাবু তাঁহার হস্ত ধরিয়া লইয়া একখানি চৌকীর উপর মহা সমাদরে তাঁহাকে বসাইলেন। শ্রীগোবিন্দের আকৃতি মলিন; অঙ্গ ক্ষীণ; মুখ চিন্তাপূর্ণ; চক্ষুর্দ্বয় শুভ্রবর্ণ এবং শ্মশ্রু কেশবিহীন। পরিধান 'রেলিভ্রাতার' ভবনের থান ধুতি; অঙ্গে পিরিহান আচ্ছাদন; এবং সীমান্ত-সীবিত উত্তরী স্কন্ধদেশে লম্বমান। কার্ত্তিক বাবু, গোবিন্দ সাহেবের নিকট * আমাদিগের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, "আপনি যেমন আমার বন্ধু, আজ হইতে ইহাঁদেরও সেইরূপ বন্ধু হইলেন।" কিছুক্ষণ সকলে নীরব। তৎপরে কার্ত্তিকচন্দ্র সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "টাকার যদি এতই অনাটন হইয়াছিল, আমাকে লিখিয়া পাঠাও নাই কেন?" "কল্লার বিক্রয়ের কারণ কি ছিল?" গোবিন্দ বাবু উত্তর করিলেন, "কার্ত্তিক, তুমি সময়ে সময়ে আমাকে অনেকবার অর্থের সাহায্য করিয়াছ; তোমার নিকট আমি অতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। এ জন্মে যে তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব, এমন সম্ভাবনাও নাই। আপাততঃ আমার হাতে টাকা নাই মনে করিও না; কিন্তু যাহা কিছু আছে, তাহা আর ধোবাকে দিয়া অপব্যয় করিতে পারি না। নচেৎ

---

* প্রথম প্রথম বিলাত হইতে আসিয়া "গোবিন্দ বাবু" বলিলে চটিতেন এবং রাস্তায় ছেলেরা "বাবু" বলিলে, তাড়া করিয়া যাইতেন। যদিও তাঁহার এখন আর সে স্বভাব নাই, তথাচ আমাদের পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ সাহেব নাম মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

তোমার নিকট হইতে টাকা চাহিতে লজ্জা কি ছিল ?” সাঙ্গাত অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গোবিন্দ বাবুর বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য আমরা নিতান্ত উৎসুক হইলাম। গোবিন্দ বাবুও সে সুখে আমাদিগকে বঞ্চিত করিলেন না। বলিলেন “অধ্যবসায়, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং সাহসিকতা উন্নতির মূল; কিন্তু উপযুক্ত বিষয়ে, উপযুক্ত সময়ে, সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করা চাহি। নচেৎ মরুভূমিতে বীজ বপন তুল্য নিস্ফল হয়। আমার অবস্থা ঠিক সেইরূপ, কিন্তু সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। আমার ভয়, পাছে আমার ইতিহাস কীর্ত্তিত হইলে, অধ্যবসায়, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং সাহসিকতার নামে কলঙ্ক রটে, লোকে আর উহাদিগের তাদৃশ আদর না করে। আমার অবস্থা—পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী বন্ধক; শ্বশুর বড় মানুষ,—আমার স্ত্রী, দুইটী শিশু সন্তানের সহিত, তাঁহার পিতৃগৃহে বাস করিতেছেন। আমি একবার ৮৲ টাকা লইয়া মফস্বলে কোন আদালতে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলাম আমার, বারিষ্টরদের বসিবার গৃহে, প্রবেশ-নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে—একঘরে করিবে এবং জাতিতে ঠেলিবে। আমি ভাবিলাম, হায়! রামে রাবণে একত্র হইয়া বুঝি আমার প্রাণবধ করিল। বৈষ্ণবকুল হারাইয়া, তাঁতিকুলে ছিলাম, এখন বুঝি তাহাও যায়। অদ্য ছয় মাস হইল, হাইকোর্টে গমন করা বন্ধ করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আমার নামে, একটা ডিক্রী জারি আছে, সেই জন্য মনে করি, মুনিঋষিরা যে গিরিগুহায় বাস করিতেন, সে ভালই ছিল।

কথা শেষ হইলে পর, ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। বেলাটা অতিরিক্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এইখানেই স্নান আহার করুন; কোন বিশেষ কথা আছে; আহারান্তে, চারিজনে মিলিয়া একটা পরামর্শ করিতে হইবে।" স্যাঙ্গাত বলিলেন, "না, এখানে থাকা হইবে না, বাসায় যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "তাহা হইতে পারে না, কার্ত্তিক বাবু বড় দুঃখিত হইবেন।" জনান্তিকে স্যাঙ্গাতকে বলিলাম, "বাসায়, না গেলেই কি নয়? সেখানে ত একেবারে জামাই আদর! পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন প্রস্তুত করিয়া কেউ ডাকাডাকি করিতেছে কি?"

সেই দিবস দ্বিপ্রহরে আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিয়া, কার্ত্তিক বাবুকে বাধিত করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাগ্রত করিতে নিষেধ করিয়া, মহাসুখে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী। এ হেন রাত্রিতে, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র, শ্রীরসিক-চন্দ্র দাস এবং আমি—এই চারি বন্ধুতে, কার্ত্তিক বাবুর গৃহের কোন নিভৃত প্রকোষ্ঠে, চারিখানি চৌকীর উপর, নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছি। চতুর্দ্দিকেও নিস্তব্ধতা বিরাজ-মান। নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। আমা-দিগকে দেখিলে অনেকেরই বোধ হইবে যে, আমরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কার্ত্তিক বাবু বলিলেন,—"আমার একটী

প্রস্তাব আছে ; এস, আমরা চারি জনে মিলিয়া কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করি ; এখানে অনেক সভা আছে বটে, কিন্তু একটির অভাবে অপরগুলি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।, আমাদের সভা এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, যে যাহা চাহিবে, সে তাহা পাইবে ; যাহার যে কামনা, তাহা পূর্ণ হইবে। ইহার মূল উদ্দেশ্য, ভারতের উন্নতি; নাম "প্রার্থনা-পূরণ সভা" থাকিবে।

সভার নামে, সাঙ্গাত আমার, বৎসহারা গাভীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কার্ত্তিক বাবুর বিশেষ করিয়া বলা উচিত ছিল, সভায় কি কি বিষয় তর্কিত এবং আলোচিত হইবে। আমার মতে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই বক্তৃতা না হয়।" কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, "ইহা দ্বারা, ভারতবাসীর সকল অভাব মোচনের উপায় অবলম্বন করা যাইবে ; যাহার যে অভাব আছে, জানাইলে, তদণ্ডে সকল সভ্যগণ তন্মোচনার্থ যত্নবান্ হইবেন। যে খাইতে পায় না, তাহাকে খাইতে দিব ; কামাস্কাটকায় দুর্ভিক্ষ হইলে চাউল দিব ;—বিধবার বিবাহ দিব ; যাহার মোকদ্দমার খরচ জুটে না, তাঁহাকে টাকা দিব ; যে সাক্ষী পায় না, তাহার হইয়া সাক্ষ্য দিব ; যাহার মুরুব্বি নাই, তাহার মুরুব্বি হইব ; যে শিক্ষক পায় না, তাহার পণ্ডিত হইব ; রোগী চিকিৎসক না পাইলে, কবিরাজ হইব ; ঔষধ না পাইলে, ঔষধ দিব ; যাহার চাকরি হয় না, তাহার চাকুরি করিয়া দিব, কিম্বধিক, যাহার যে প্রার্থনা, তাহা পূরণ করিব, বা পূরণ করিতে চেষ্টা করিব। সভার এই এক সুমহৎ

উদ্দেশ্য হইবে। সমস্ত সভ্যগণ জীবন উৎসর্গ করিয়া এই মহাব্রত পালনে উদ্‌যোগী হইবেন।"

আমি বলিলাম, "যদি সভার কার্য্য অল্য হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, আমার বড় একটা আশু উপকার করা হয়। বাটী হইতে পত্র পাইয়াছি যে, গত পরশ্ব তারিখে আমাদের দোহা গাভীটি গোঁজ উপড়াইয়া দড়িশুদ্ধ পলাইয়া গিয়াছে; দড়িগাছটি যায় যাক্, যাহাতে গাভীটি পাই, অনুগ্রহ করিয়া আপনারা তাহার চেষ্টা করিবেন। আর যদি একটু ছেলে হবার ঔষধ আপনাদের সভা হইতে দেন, তাহা হইলে বড় বাধিত হই। কার্ত্তিক বাবু আছেন, সাঙ্গাত আছ, যাহাতে আমার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। ভোগের আগে প্রসাদ পাইয়া, আমার প্রার্থনা, নিবেদন করিয়া রাখিলাম।"

সাঙ্গাতের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কুটিল নয়নদ্বয় কপালে উঠিয়া ঘুরিতে লাগিল। বিকৃত স্বরে, আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "পরিহাস?"—তৎপরে, মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত কথা নাই বলিয়া, ইংরেজি-ভাষায়, অজস্র-ধারে সভ্য সমাজ অনুমোদিত গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকার, ইঙ্গিত, ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, সাঙ্গাত বা আমাকে সভ্যদেশের আইন জানিয়া প্রহার করেন।*

---

* "কোন সভ্য কোন অসভ্যকে প্রহার করিলে, কিম্বা একেবারে মারিয়া ফেলিলে, নালিষ চলে না; চলিলেও ডিস্‌মিস্ হয় এবং ফরিয়াদি দণ্ড পায়; ফরিয়াদীর অভাবে তৎপক্ষীয় সাক্ষীগণ কিম্বা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ দণ্ডিত হয়।"

সভ্য মুলুকের দণ্ডবিধি, ১ম ধারা।

এমন সময়, নিরীহ ভাল মানুষ, গোবিন্দ বাবু মধ্যবর্ত্তী হই-লেন, এবং বলিলেন, "আপনাদের কে কখন কাহাকে পরি-হাস করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আপনাদের ঝগড়া করা উচিত হয় না। বিশেষ এ সময়ে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে, কার্য্য সফল হইবে না। এইরূপ গৃহবিবাদেই সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিরাজ্য উৎসন্ন হইল।" আমরা উভয়েই অপ্রতিভ হইলাম।

কার্ত্তিক বাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করা উচিত হয় না। সভা, কলি-কাতার গড়ের মাঠে বসিবে। উপরে এক বৃহৎ চন্দ্রাতপ আচ্ছাদন দেওয়া যাইবে। নীচে মাদুরি পাতিয়া বিছানা করিতে হইবে; কিন্তু যাঁহারা পরিধেয় বস্ত্রের অনুরোধে মাদুরিতে বসিতে অক্ষম, কেবল তাঁহাদের জন্যই কতকগুলি বেঞ্চ এবং চেয়ার রাখিতে হইবে। সভা প্রত্যহ দিন দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত থাকিবে—তৈলের খরচ লাগিবে না। এখানে জাতিভেদ থাকিবে না। কলিকাতায় সভার মূল কাণ্ড থাকিবে; আর হুগলি, কৃষ্ণনগর, বৰ্দ্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইহার শাখাসভা বসাইতে হইবে; আর কোন্নগর, গরিফা, কাঁচরাপাড়া, গোপীনগর প্রভৃতি পল্লীগ্রামে, এই মহাকাণ্ডের এক পত্রসভা সংস্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমেই কতকগুলি উপযুক্ত সভ্যের আবশ্যক। কল্য প্রাতঃকালে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সভ্য অন্বেষণে আমরা চারিদিকে বহির্গত হইব। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এ বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিয়া, লোক-

সাধারণকে জ্ঞাত করাইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, অদ্য হইতেই আমরা চারি জন এ সভার সভ্য হইলাম।”

বন্ধুচতুষ্টয়ের মধ্যে আমি কেবল শেষ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না;—বলিলাম, “সভায় গমন করিবার আমার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। আপনারা পরিহাস বিবেচনা করিবেন না;—ইহা গুরুর আজ্ঞা—বড় কঠিন আজ্ঞা। যে দিবস আমি দীক্ষিত হই, সেই দিন গুরুদেব আমার কর্ণ-বিবরে এক বীজমন্ত্র ঢালিয়া দেন। সেই দিন হইতে, রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক উদ্বেগ এবং স্বোদর সেবন আমি একত্র সমাধা করিয়া থাকি। সেই দিন অবধি আমার হস্তপদ বদ্ধ হইয়াছে। না হইলে, আপনারা কি আমাকে এতক্ষণ এখানে দেখিতে পান?”

সাঙ্গীত শিহরিয়া উঠিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কি ভাই! কি প্রতিবন্ধক? আমি বলিলাম” “ভাই, বীজমন্ত্র কাহাকেও বলিতে নাই; কিন্তু আপনাদের সহিত আমার সেরূপ ভাব নহে; সকলে এক আত্মা, এক প্রাণ, এক মহাব্রতে ব্রতী। বীজমন্ত্রের অর্থ এই যে, ‘তুমি সেস্থানে গমন করিবে না, যেখানে জলখাবার পাইবার সম্ভাবনা নাই।’” সাঙ্গীত বলিলেন, “যদি সত্য সত্যই গুরুদেবের এরূপ আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে, তাহাই হইবে, তজ্জন্য আটক হইবে না।”

আমি বীরদর্পে অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠিলাম। বলিলাম, “কে আমার সঙ্গে আসিবে, এস। সভ্য অন্বেষণে বহির্গত হই। এইরূপে কার্তিক বাবু দেশের উন্নতির আশায়, সাঙ্গীত বক্তৃতার লোভে, আমি ভৌতিক উৎসাহে; এবং

গোবিন্দ বাবু অনুরোধে,—আমরা চারি জন সেই সুগভীর রজনীতে গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে পদব্রজে সদর রাস্তায় বাহির হইলাম। ভারতের ভাবী-আশা, মানবজাতির গৌরব, সভ্য সমাজের নেতা, বঙ্গবাসীদের মুখ-চাওয়া-ধন, কুলতিলক চতুষ্টয় ভারত-উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলাম।

নগরের আর গোলমাল নাই। রাস্তায় ভিড় নাই। গোশকটগুলা কোথায় লুকাইয়াছে। দিবসের যিনি কোলাহল শুনিয়াছেন, তিনি বলিবেন, কলিকাতা এখন নিস্তব্ধ। নভোমণ্ডলে তারাদল-সহ চতুর্দ্দশী-চন্দ্র হাসিতেছে, পৃথিবী-প্রদেশে গ্যাসালোক-সহ রসিকচন্দ্র হাসিতেছেন। পরিশ্রান্ত জীবগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সাঙ্গাত তখন বলিতে লাগিলেন, "হে কলিকাতাবাসিগণ! আর ঘুমাইও না, নেত্র মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখ, কি কাণ্ড উপস্থিত!" আমি বলিলাম, "ভাই, রাস্তায় গোল করিও না, পুলিশে ধরিবে। আর এই মাত্র সকলে ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহারই মধ্যে উঠিবে কেন? কাঁচা ঘুমে জাগ্রত করিলে, পেটের ব্যারাম হইবে।" এবার সাঙ্গাত দ্বিরুক্তি না করিয়া চুপটি করিয়া রহিলেন। আমি তখন সাঙ্গাতের অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত মিত্র, ঠাকুর, পাল প্রভৃতিকে আমন্ত্রণার্থ—ভিন্ন পন্থায় শকটারোহণে চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে, কার্ত্তিক বাবুর বৈঠকখানায় আমি নিদ্রাভিভূত। এদিকে কার্ত্তিক বাবু এবং গোবিন্দ বাবুর ক্ষমতায় অনেকগুলি বড় বড় বাছা বাছা সভ্য মিলিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই তাঁহারা সহর্ষময় মনের উল্লাসে ঘুরিয়া সে নিশা পরহিতে

যাপন করিলেন। অরুণোদয়ের সময় সাঙ্গাত আমার ঘুম ভাঙ্গাইলেন। বলিলেন "সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দিলে, এ মহাসভার বিষয় কলিকাতাস্থ বাল-বৃদ্ধ-যুবা, ছোট, বড়; ইতরসাধারণ সমস্ত লোক কিরূপ প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারে? কিন্তু অদ্য আর বিজ্ঞাপন দিবার সময় নাই। উপায় কি?" ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। "হায়রে! পরের জন্য এত করি, এত ভাবি। পর আমাদের জন্য এক দিনত ভাবে না।" অবশেষে সাঙ্গাত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে সহরময় ঢেঁট্রা দেওয়া হইবে। সাঙ্গাত এই কার্য্যের ভার লইলেন; কার্ত্তিক বাবু এবং গোবিন্দ বাবু গড়ের মাঠে সভা সাজাইতে গমন করিলেন। আমি আবার শকটারোহণে বহির্গত হইলাম। বৌবাজারের মোড়ের কাছে দেখিলাম;—হরিহর বায়েন স্কন্ধে টয়ে-বান্ধা জয়ঢাক করিয়া তাহাতে কাঠি দিতে দিতে, সাঙ্গাতের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে; সাঙ্গাত মধ্যে মধ্যে এই বচন আবৃত্তি করিতেছেন,—"ওহে, ভাইসকল, আজ দিন দশটার সময়, গড়ের মাঠে, প্রার্থনা-নামক সভা বসিবে। যে খাইতে পায় না, সেই খাইতে পাইবে, যে পরিতে পায় না, সে পরিতে পাইবে, রোগী ঔষধ পাইবে। যাহার চাকরি নাই, সে চাকরি পাইবে,—প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ওহে ভাইসকল! যে যেখানে আছ, দৌড়িয়া আইস।" আমার গাড়ি চলিয়া গেল, সাঙ্গাত আমাকে দেখিতে পাইলেন না।

একদা মৃত মহাত্মা দাশরথী রায় আমাকে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক

বলিয়াছিলেন যে, "যদি সন্ন্যাসী গায়, তিনকড়ি বাজায় এবং আমি ছড়া কাটি, তাহা হইলে দেশে আর টাকা রাখি না।" কিন্তু এখন যদি তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়া বলি, "যদি কার্ত্তিক বাবু সভাপতি হয়েন, সাঙ্গাত বক্তৃতা করেন, গোবিন্দ বাবু অধ্যক্ষ হন, তাহা হইলে, এক দিনেই ভারতমাতার উদ্ধার হয়।" কিন্তু দেহ পঞ্চভূতে না মিশাইলে, এ জীবনে কত সাধই যে বাকি থাকে, তাহা এ গরিব, মুখে কত বলিবে?

দশটার সময় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইয়াছে। লোকে লোকারণ্য। সভাপতি কার্ত্তিকচন্দ্র বিরাট আসনে, গম্ভীর ভাবে, আসীন; বামে বাগ্মীপ্রধান সাঙ্গাত—অতিশয় ব্যস্ত; উত্তমাঙ্গের কেশ কণ্ডুয়নেরও অবকাশ নাই; দক্ষিণে নবছত্রদণ্ড ধারণ করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ গোবিন্দ বাবু; সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান—স্বয়ং পবনন্দন আমি। তৎপরে মন্ত্রণানিপুণ, বয়োজ্যেষ্ঠ, শুভ্রকেশ, কৃতবিদ্য জাম্ববানগণ। তাহার পরে মহারাজা, রাজা, রায়বাহাদুর প্রভৃতি ধনী মানী সভ্যগণ। শেষে অনন্ত সাগরের অনন্ত বুদ্বুদতুল্য মনুষ্য সমাবেশ। আমার প্রতি আদেশ হইল যে, তুমি অগ্রে কটক চর্চ্চাইয়া আইস—কিরূপ ধরণের কত লোক আসিয়াছে,—তৎপরে বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। আমি দিব্যচক্ষে সমস্তই দেখিতে লাগিলাম—৫জন বারিষ্টার; ১৫০ এম, এ,; ৩০০ এম, এ, বি, এল, ৫০০ বি এ, বি, এল; ৭০০ বি, এ; ১০০০ এল, এ; ১২০০০ এনট্রেন্স পাস; ৩২০০০ এনট্রেন্স ফেল—সতৃষ্ণ নয়নে সভাপতির মুখপানে

চাহিয়া চাকরি প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন; বুঝিলাম, সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া অনেকে আসিতে পারেন নাই।

দেখিলাম, উইলিয়াম্ গড়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একখানি "বিষবৃক্ষের" আরম্ভের মত মেঘ উঠিতেছে। তখন ব্যস্ত হইয়া আমার জল খাবারের বন্দোবস্ত কোথায় হইয়াছে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। মেঘ ক্রমে গুরুতর হইতে লাগিল; সভাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম "আমার কই?" সাঙ্গাত জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি যে কাষ করিতে গিয়াছিলেন, তাহার কি?" আমি বলিলাম, "আগে আমার জল খাবারের বিষয় বুঝাইয়া দাও, পরে তোমাদের বিষয় বলিব।" সাঙ্গাত বলিলেন, "এখানে আপনার আবার জলখাবার কি?" এবার বিমান-গড়ে বিরাট তোপ হইতে লাগিল; আমি বলিলাম, "কি বলিলে, বিশ্বাসঘাতক? ইহাই কি তোমাদের স্বদেশহিতৈষিতা? ইহাতেই কি তোমরা আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া, পবিত্র আর্য্যকুলে কলঙ্কারোপ করিতে চাও? ইহাতেই কি তোমরা স্বাধীন হইতে চাও? কুলাঙ্গার! জিহ্বা কাটিয়া নরককুণ্ডে ফেলিয়া দাও,—তোমাদের কথার ঠিক নাই কেন? লোকের আশা ভঙ্গ করিয়া কি সুখ পাও? ধিক্! যদি আমি পিতার পুত্র হই, যদি নিজ নারীর মুখ ব্যতীত অপর নারীর মুখ কখন না দেখিয়া থাকি, যদি আমি ইংরেজ-পাদুকা এ উত্তমাঙ্গে কায়মনোবাক্যে চির দিন বহন করিয়া থাকি, তাহা হইলে এখনি এই সভায় বজ্রাঘাত হইবে।

ঝড় উঠিল। বিদ্যুৎ চমকিল। মেঘ ডাকিল। ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া, সাঙ্গাত-প্রমুখ সভ্যসকলকে আর্দ্র করিতে এবং প্রহার করিতে লাগিল। আমি লুক্কায়িত হইবার স্থান ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এক এক বার আকাশ কড়্ কড়্ করিয়া ডাকিয়া উঠে, আমি নয়ন মুদ্রিত করি, আর কতকগুলি শিল, ঝড় ঝড় করিয়া পড়িয়া যায়। হঠাৎ পৃথিবী আলোকিত হইল। অমনি বাজ পড়িল। সেই নিদারুণ বজ্রাঘাতে স্থাবর জঙ্গমাত্মিকা মহী কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত সভ্যই মূর্চ্ছাগত। আমিই কেবল ভয়াদ্র হৃদয়ে মিটি মিটি দেখিতে লাগিলাম।

এহেন সময়ে বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত বৃষ্টির মধ্যে, পার্থিব জীব লোকের অচেতন অবস্থায়, এক দৈববাণী হইল, বজ্ররূপ কঠিন কলমে লিখিত হইল; স্বয়ং মহাকাল পাঠ করিলেন; এবং স্বয়ং আমি শ্রবণ করিলাম।

"যাও বৎস! গৃহে যাও; সভা করিতে পারিলে না বলিয়া কুণ্ঠিত হইও না; কলি-কল্মষনাশন সংবাদপত্রে ছত্র পূরণ করিতে অভ্যাস কর; ভারতের সকল দুঃখ দূর হইবে।"

শাশুড়ী বউ।

কলিকালে বউ রাজা। যা করে তাই হয়; যা বলে, তাই ফলে; অতুল ক্ষমতা; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কুবের, হুতাশন, সম্মুখে থরহরি কম্পবান। মন্দমতি আমি, বধূর বিরুদ্ধে কি আরজি লিখিব?

কলিকালে বধূ স্বামীর মাথার মহামণি,—আন্ধার ঘরের আলো; উদরের ক্ষুধা, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক; বৌমা স্বামীর সর্ব্বস্বধন, অঞ্চলনিধি, নীলমণি। বৌয়ের-কথায় সুধা বর্ষে, হাসিতে মুক্তা ঝরে. চন্দনে মেদিনী কাঁপে—ঐরাবত লজ্জা পায়, ক্রন্দনে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়;—স্বামীর স্বামী, বউ ভগবান্, সেই প্রলয়জলে খট্টাঙ্গরূপবটপত্রে যোগ-শয়ন করিয়া থাকেন। বউ রন্ধনে দ্রৌপদী, গৃহকার্য্যে বিশ্বকর্ম্মা, পতিসেবায় বেহুলা, বিদ্যায় মা—সরস্বতী। পৃথিবীর সার ধন এহেন বৌ-ধনের বিরুদ্ধে আরজি লেখা আমার কর্ম্ম নয়। টাকার লোভে কি বঙ্গীয় বৌ-মার কোপানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইব?

কিন্তু ঐ শুন, ওদিকে ক্রন্দন ধ্বনি কিসের? "হায়! অদৃষ্টে কি এই ছিল? কিন্তু দুঃখ করিব না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না, বাছার আমার অমঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া নীরবে একটী বৃদ্ধার নয়নযুগল হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল,—এ দৃশ্যটী কি? বধূর খাসমহলের প্রজা, শ্রীগোলাম দাস, যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার পিতার কাল হয়; জননী দাসীবৃত্তি করিয়া স্নেহময় পুত্রের লালন পালন করিল, পুত্র সোণার শশীর ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাতা কলিকাতায় আসিয়া, কোন গৃহস্থের বাড়ী রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইল। পুত্র ক্রমে বি, এল পাস করিয়া উকীল হইল,—তখন জননীর জন্মের সাধ, রাঙা বধূ ঘরে আসিল। সেই দিন অভাগী মাতার সংসারের সকল সুখ, সকল আশা ফুরাইল। জননী সেই দিন অবধি নানা অপরাধে অপরাধিনী হইল,—

জননী চোর, হাঁড়িতে খায়, বধূকে মর্ বলিয়া, মা তুলিয়া, বাপ্ কাটিয়া গালি দেয়; সংসারের যত ভাল সামগ্রী, সব আপনি উদরসাৎ করে,—অধিক কি মাতা ক্রমে ডাইন হইল। কিন্তু পুত্রের বড় দয়ার শরীর, মাতার প্রতি বহুকাল হইতে অনুগ্রহও কিছু ছিল, এবং পূর্ব্বের কৃত কর্ম্ম মনে করিয়া মাতাকে ডাইন অপরাধে, পুলিশের হাতে সোপরদ্দ না করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ডাইনী মা—পোড়ার মুখী, তাই কল্লা করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে বসিয়া আজ কাঁদিতেছে।

আজকাল ছেলেগুলো স্ত্রীকে কি যেন একটা অপূর্ব্ব জিনিস্ মনে করে,—তাঁর কথাই বেদ, তাঁর কথাই ব্রহ্ম, তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী। যে সকল একরত্তি একরত্তি মেয়ের *গলা টিপিলে দুধ বার হয়, সহবৎ শিখাইতে* যাহাদিগকে প্রতি কথায় চক্ষু রাঙ্গান উচিত, তাহাদের হাতে এরূপ ক্ষমতা থাকিলে আর কি রক্ষা আছে?—সংসার ভূকম্পের ন্যায় অবশ্যই টল্ টল্ কাঁপিবে।

পুত্রের দোষেই বধূগণ এরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। পুত্রের আদরের বউ, শাশুড়ীকে রাঙ্গাপদের চরণরেণু অপেক্ষাও নীচ বিবেচনা করেন। বউ রাণী, শাশুড়ী তাঁর বাঁদী। শাশুড়ীর আক্ষেপ উক্তিপূর্ণ এই শ্লোকই তাহার পরিচায়ক;—

বেটা বেয়ানু, বউকে দিনু, বৌয়ের হলাম বাঁদী;
এখন ইচ্ছা হয় যে বাহিরে বসে কাঁদি।

এখন আর সেকাল নাই,—সাবেক আইন উঠিয়া গিয়াছে; খাটিয়া খাটিয়া রাত্রে শয়ন করিলে পর, বৌমা আর শাশুড়ীর

পায়ে তৈল মাখান না,—আহারান্তে শাশুড়ীর থালাপাথর মাজা দূরে যাউক,—একটা পান বা এক গ্লাস জলও এখন আর পোড়া শাশুড়ীর হাতে তুলিয়া দেন না। পুত্র কৃতবিদ্য হইলে, বউ উপযুক্ত হইলে,—কলিকালে জননী সত্য সত্যই চাকরাণী হয়েন। তবে একটু প্রভেদ এই, জননী বিনা মাহিনার চাক্‌রাণী; কেবল পুত্রস্নেহের ভিখারিণী। বধূর হিসাবে শাশুড়ী চোর হইলেও, বস্তুত সে বাজারের পয়সা চুরি করে না। চাক্‌রাণীকে ভর্ৎসনা করিলে, সে অপর ঘরে যায়; জননী ভর্ৎসিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত হইলেও, বধূর গৃহে বারমাস ভাতেজলে থাইয়া অবস্থিতি করে। একমাত্র পুত্রের দোষেই জননীর এরূপ দুরবস্থা। পুত্র, বউকে শাসনে রাখিতে জানে না, সহবৎ দিতে জানে না,—শাসন সহবৎ দূরে যাউক্, বৌয়ের দোষ, পুত্র, গুণ বলিয়া বাখ্যা করেন,—নচেৎ বউ রাগ করিবেন। ধরিত্রী সর্ব্বংসহা, তাই এত সহিতেছেন; নচেৎ পুত্রের পাপে, বধূর পাপে ধরণীদেবী মনঃক্ষোভে এত দিন অতল জলে ডুবিয়া যাইত।

জননী কি এতই অপরাধিনী, এতই পাপিনী যে, এত লাঞ্ছনা করিয়া কি তোমাদের আশা মিটিল না, আবার তাঁহার নামে বঙ্গবাসীতে প্রবন্ধ লেখা? আবার একটী মেয়েলি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছ যে, শাশুড়ী বধূর প্রতি কিরূপ অন্যায় আচরণ করে, এই শ্লোকই তাহার পরিচায়ক। ছি! স্ত্রীর অনুরোধে কি এতটাই করিতে হয়? যদি ছড়ার কথা বলিলে, বোয়ের বিরুদ্ধে, পুত্রের বিরুদ্ধে একাধারে যুক্ত-ছড়া নাই কি? পুত্রের উক্তি;—

মা, তোমার যে অতি, বেজায় কুমতি
বউকে দেখে একটু সঁমিহ কর না।
এ ধূপের বেলা সে রাঁধে দু-বেলা
তুমি বুড়ীবেটি বসে খাও, নড় না॥
সে নাকি ঘর-নিকুনী তুমি নাকি ঘরের গিন্নি
এ শুনেত আমার প্রাণ আর বাঁচে না।
রুখু চুলে নেয়ে, হাত তোলা খেয়ে,
তার সোণার বরণ আর টেকে না॥
যাকে যা সে দেবে, সেই তাহা পাবে,
তাছাড়াত কেউ পাবে না॥
বৌ এর পায়ের ধুলা লব, মাথায় করে র'ব
তোমার বাবার কি তা বল না॥

ননদ-ভাজ।

সংসারে আমার কি কেউ নাই? আমি অবলা, অনাথা, জন্মদুঃখিনী আমার হইয়া আপনারা দুকথা লিখিবেন কেন? আমি নিজের দুঃখে কাতর নহি—এ পোড়া দেহে কিনা সয়? সেই দরিদ্রের মাণিক, অন্ধের নড়ি, জীবনের অবলম্বন সেই বাছার আমার, দুঃখ দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যায়।

এ সংসারে দাদা বই আমি আর কাহাকেও জানি না, দাদা আমার রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, স্নেহমমতার একমাত্র আধার। অল্প বয়সে শ্বশুরালয় হইতে ভ্রাতৃগৃহে আসিলাম,—

কোলে কেবল ছয়মাসের শিশু সন্তান। মাতা পিতা অনেক দিন হারাইয়াছি, জগতের দুর্লভ রত্ন, ইষ্টদেব, মহাপুরুষ স্বামী-কেও হারাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল দিন কাটিতে লাগিল,—স্নেহের সাগর; দয়ার ভাণ্ডার, ভ্রাতা আমাকে বুঝাইতেন, "হাস্যমুখ, প্রফুল্লকমলতুল্য সন্তান তোমার কোলে রহিয়াছে, তোমা অপেক্ষা সুখী কে? আর আমি তোমার সহায়, তোমার ভাবনা কিসের? তুমি যদি চক্ষের জল ফেল, আমি গৃহে থাকিব না। দাদার সেই অমৃতময় বাক্যে মনে বড় আনন্দ হইত।

কলেজের পড়া শেষ হইলে, দাদা বিবাহ করিলেন। ভ্রাতার বিবাহের জন্য আমি বহু দিন হইতে লালায়িত ছিলাম; নবম বৎসরের কন্যা—জন্মের সাধ বধূ গৃহে আসিলেন; আমার অন্তরের যে কত আনন্দ, তাহা আর কাহাকে বলিয়া শেষ করিব। বৌ লেখাপড়া শিল্পকর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, পাছে বৌয়ের প্রতি দাদা সন্তুষ্ট না হন, এই ভাবিয়া আমি কত যত্ন করিয়া, কত সাধ্যসাধনা করিয়া, লেখা পড়া শিখাইলাম; ছুঁচের কাজ, পশমের কাজ শিখাইলাম; ভাল সহবৎ শাস্ত্র নাই, সাধ্যমত কত ভালকথা শিখাইলাম, কত সদুপদেশ দিলাম। বধূর পিতা দরিদ্র ছিল, আমি একে একে নিজের সমস্ত গহনাগুলি বধূর অঙ্গে পরাইয়া দিলাম। দাদাকে বলিলাম, আমার গহনায় কায কি?—বউ পরিলেই আমার সুখ। গৃহের যত ভাল ভাল সামগ্রী দাদাকে না দিয়াও বউকে খাওয়াইতাম, স্বহস্তে মাথা বাঁধিয়া দিতাম, আমার যত বহু-মূল্যের ভাল কাপড় সবই পরিতে দিতাম। গৃহের প্রাচীনা

দাসী বলিত—'দিদি ঠাকুরুণ! বৌকে যে সব দিয়া আপনি ক্রমে ফকির হইলেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপে বলিলাম, "দূর বুড়ী পাগ্‌লী, তুই জানিস, আমার প্রাণের সুরেশ অপেক্ষা, বৌকে বেশী ভাল বাসি।"

ক্রমে বউ মানুষ হইলেন। ক্রমে বধূর গুণগ্রাম প্রকাশ হইতে লাগিল। বিধাতা আমার অদৃষ্টে ভাল লেখেন নাই —আমার দুঃখ করা বৃথা। ক্রমে আমার খাওয়ান, মাখান, পরান বৌয়ের পছন্দ হইল না—আমার গৃহিণীপনায় বৌয়ের শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি হইল? অমৃতে হলাহল উঠে কেন? আমি স্বহস্তে জল খাবার দিতে না গেলে দাদা সন্তুষ্ট হইতেন না, বৌ এক দিন আমার হাত হইতে জলখাবার কাড়িয়া লইয়া দাদাকে দিতে গেল। আমি ক্ষান্ত হইলাম; নীরবে এক ফোটা জল চক্ষুপ্রান্তে আসিল। ভাল মাছ আসিলে দাদা আমাকে রাঁধিতে বলিতেন; দাদা কয়েক জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি বৃহৎ রুই মাছের কালিয়া করিতে গেলাম—সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময় বউ আসিয়া বলিলেন,—"সর, সর এখানে থেকে উঠ, আমি রাঁধবো।" আমি মনে ভাবিলাম, বউ যদি রাঁধেন, তাহা হইলে কাহাকেও ভক্ষণ করিতে হইবে না,—নিমন্ত্রণ পণ্ড হইবে,—দাদাই বা আমাকে বলিবেন কি? প্রকাশ্যে বলিলাম, "বউ আজ থাক, আর এক দিন তুমি রেঁধো।" আমার এই অপরাধ। আর সে কোথা যায়?' বউ তখন সৃষ্টিসংহারিণী মূর্ত্তি ধরিলেন,—সে মূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই,—কখন কল্পনায়ও ভাবি

নাই,—বিকট কণ্ঠে বলিলেন—"কি বলিলি হতভাগিনি, (আমার দোষেই নাটক পড়িয়াছিলেন) আমি আর এক দিন রাঁধবো? এ কার ঘর, কার দোয়ার তুই জানিস্?—আজ দূর করে দিলে তোকে রাখে কে? তোর অনেক দোষ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর সহ্য হয় না। তুই এখনই দূর হ—।" আমি অবাক্ হইলাম, কোন কথার উত্তর দিলাম না, কেবল চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তখনও নিস্তার নাই—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। বধূ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"অ্যাঃ বড় শক্ত কথা বলা গেছে কি না,—তাই আবার কাঁদিতে বোসলেন, খবরদার, এখানে চোখের জল ফেলতে পারেনা—আমাদের অমঙ্গল হবে। উচিত বল্লেই রাগ হয়—চখে জল আসে। কথায় কথায় চোখে জল। মাছের কালিয়া কোর্ত্তেন, আর ব্যাটার জন্য একবাটী লুকায়ে রাখতেন,—সেটা আর হলো না কি না—তাই অমনি চোকে জল এলো।" তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না,—বলিলাম, "বউ অমন কথা আমাকে বলো না,—আমি ছেলেকে কোন জিনিষ লুকায়ে খাওয়াই নাই—আমাকে যা বলতে হয় বল, বাছাকে আমার কোন কথা বলো না।" "বলবো একশবার বলবো। কার খেয়ে তোর ছেলে এত বড় হলো?" বলা বাহুল্য, বধূর গভীর গর্জ্জন অন্দরমহল ভেদ করিয়া সদর মহলে গিয়াছিল; দাদা বউয়ের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তীব্রবেগে গৃহে আসিলেন; বউ দাদাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া নিজ কক্ষে অর্গল-বদ্ধ

করিলেন—দাদা আমাকে সম্মুখে পাইয়া, কাহার দোষ না বুঝিয়া আমাকেই কতকগুলা বকিলেন; বলিলেন আজ ৩৷৪ জন লোক আছে, তোমার এরূপ গণ্ডগোল করা উচিত কি? এই বলিয়া দাদা বাহিরে গেলেন। আমার দুঃখের উপর দুঃখ হইল—প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আর রাঁধিব না, কিন্তু না রাঁধিলে ফল বিষময় হইবে বলিয়া মনোদুঃখে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে সকলের আহার হইল, দিবাবসান হইল; বধূ তখনও খিল খোলেন নাই; দাদাও জানিতেন না বধূ এরূপ ভাবে গোসা-ঘরে শায়িত। সন্ধ্যার সময় জল খাইতে আসিয়া তিনি সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলেন। বউ দাদার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, তাহা আর কি বলিব? কিন্তু দাদার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলাম; দাদা মন্ত্রৌষধ গুণে যেন নতশির সর্প হইলেন। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বউ দাদাকে যখন কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলাম, সন্দেহ নাই; বধূর পাদ-পদ্ম ভ্রাতার করতলধৃত হইলেও যখন মানিনীর মান ভাঙ্গিল না—তখন গভীর বিস্ময়াপ্লুত হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন অন্তরালে দাঁড়াইয়া শেষ কথা শুনিলাম, সে বিষম কথা এখনও ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়; তখন মনে হইল, কেবল অবলা বধের জন্য বিধাতা বুঝি দুষ্ট সরস্বতীকে আমার ভ্রাতৃকণ্ঠে অদ্য বসাইয়াছেন। আমার সেই গুণময় স্নেহের সাগর ভ্রাতার হঠাৎ এরূপ বিপরীত মতি হইল কেন? তখন আমি ইহার কিছুই কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ইচ্ছা

হইল, তখনই পুত্রের—প্রাণধন সুরেশের হাত ধরিয়া এ গৃহ হইতে বাহির হই।

আজ জীবনের প্রথমাঙ্ক শেষ করিলাম; শেষাঙ্ক পরে বলিব। বঙ্গের ঘরে ঘরে, ভগিনীর এইরূপ দশা কি না, আমি জানি না; আমার ইতিহাস মাত্র কেবল বলিলাম।

শ্রীমতী—

রমণী-রত্ন।

কিশোরী বাবু ভাল মানুষের অগ্রগণ্য। দেড় শত খানি টাকা মাহিনা পান, ঘরে কেবল মাত্র শ্রীমতী লক্ষ্মীরূপিণী সুধামুখী স্ত্রী,—তথাচ কিছুতে কুলায় না, সংসার অচল, কষ্টের অবধি নাই। গৃহ হইতে আপিস দেড় ক্রোশের কম নহে; রৌদ্র প্রখর হউক, বৃষ্টি মুষল ধারে হউক, এক আনা দিয়া শেয়ারে গাড়ী করিবার সঙ্গতি নাই; কিশোরী বাবু স্কন্ধদেশে ছাতা রাখিয়া বোতাম-বিহীন চাপকান আঁটিয়া ছিন্ন পাদুকায় মর্ম্মাহত হইয়া, ঠুক ঠুক করিয়া সেই একই ভাবে অবিরাম চলিতেছেন। কিশোরী বাবুর চেহারা দেখিলে মনে হয়, যেন পিতৃ-মাতৃ দায় উপস্থিত, অথবা কোনরূপ প্রগাঢ় অম্লশূল ব্যারাম আছে।

গৃহলক্ষ্মীরও দুঃখের অবধি নাই; তিনি মনের মত ক্ষীর সর পান না; ভাল বারাণসী শাড়ী নাই—মতিহার মালা নাই—বোসেদের বৌয়ের মত জড়াও বালা নাই। তাঁহার

কিছুই নাই! এতগুলি গুরুতর অভাবে, সেই অবলা, সরলা বঙ্গীয় বালার চোখ দিয়া কখন জলধারা প্রবাহিত হয়, মুখ দিয়া কখন বজ্রধ্বনি বহির্গত হয়, পদভরে কখন ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। প্রতিবেশিনীগণ কাণাকাণি করে; ঘোষেদের বৌ একলামানুষ কার সঙ্গে সদাই এত বচসা করে? কিন্তু যার যাতনা, সেই জানে। কোমল প্রাণে—আর কত কষ্ট সহ্য হইবে বল? ঢের সহ্যগুণ—তাই সুধামুখী আজও স্বামীর ঘরে রহিয়াছেন।

তিনি যে দুদিন উপবাসী আছেন, তাহা কি চোখ-খাগি পাড়ার মেয়েরা দেখিয়াছে? তাঁর যে মহাশোকে অন্তর দগ্ধ হইতেছে, তাহা কি কেহ ভাবিতেছে? উঃ, আজ প্রায় এক সপ্তাহ—একযুগ অতীত হইল, অথচ তাঁহার সেই সাধের গজমুক্তা-পরিশোভিত ডায়মন-কাটা নথ আসিয়া উপস্থিত হইল না! রমণী সর্ব্বংসহা, তাই তিনি এত সহিতেছেন, নতুবা এত দিন সুধামুখীর দেহ পঞ্চভূতে মিশান উচিত ছিল।

গজমুক্তার কথা কেহ কেহ পুরাণে শুনিয়াছেন; কিন্তু ডায়মন-কাটা নথ যে কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখেন নাই। ঐ নথের কথা এক দিন ডেপুটী বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন; মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী আবার, নাপিতিনী কামাইতে আসিলে, তাহার মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন,—"ও-বাড়ীর মিত্তিরদের বড়গিন্নির জন্য বড়কর্ত্তা একটী ডায়মন কাটা নথ গড়াইয়াছেন,—আহা! সে নথটী কি চমৎকার? শুনলেম সেটীতে গজমুক্তা আছে। মিত্তির

গিন্নির আজ আর আহ্লাদ রাখিবার জায়গা নাই; সোয়ামী ভালবাস্‌লেই এই রকম হয়।" এইরূপে নাপিতিনী হইতে মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী হইতে ডেপুটী বাবুর স্ত্রী, আর ডেপুটী বাবুর স্ত্রী হইতে আমাদের সুধামুখী ডায়মন-কাটা নথের বিষয় শ্রবণ করেন। এইরূপ বার্ত্তা শুনিয়া সুধামুখী কিশোরী বাবুকে তলব করিলেন,—এবং হুকুম প্রচার করিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে মিত্তিরদের বড় গিন্নির মত নথ চাই। কিশোরী বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাঁচ দিনের পর বলিলেন, ওরূপ নথ বাজারে পাওয়া যায় না। স্বামীমুখে এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া নিতান্ত মর্ম্মব্যথা পাইলেন; বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেন নাই, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মহাপাপের ফল এতদিনে ফলিতেছে; তাঁহার দুঃখময় নারীজন্মকে ধিক্কার দিলেন; অবশেষে ভাবিলেন, স্বামী যার বশ নহে—এরূপ প্রতিকূল, তার বাঁচিয়া সুখ কি? সেই দুঃখ-সন্তপ্তা গৃহলক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। প্রতিজ্ঞাকালে শ্রীমুখ হইতে বজ্রাঘাতের ন্যায় যে ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়, তাহাতে কিশোরী বাবু মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিলেন। তিনি ক্রমে যখন সব বুঝিলেন, তখন তিনি আরও বিবর্ণ হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গময়ী স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। কিশোরী বাবু বাল্যকালে বেত্ররূপদণ্ডধারী গুরুমহাশয়কেও তাদৃশ ভয় করিতেন না, অথবা নিজ প্রভু সাহেবের কাছে যাইতেও তত ভয় করেন না; কিন্তু মহা-মনিব স্ত্রীকে দেখিলেই ভয়ে জড় সড়, যেন হাড়ি-

কাষ্ঠের নিকট মেষশাবক। আজ ভয়ের উপর ভয়; যে উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিলে দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ পলাইয়া যায়, মানুষকিশোরী কোন্ ছার? কিন্তু, অহহ!—কিশোরী বাবুর দোষেই ত তাঁহার কোমলপ্রাণা স্ত্রী এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছেন। রমণীরত্নের চক্ষু রক্তবর্ণ, অধর-ওষ্ঠ বিকম্পিত, দন্ত দু-পাটী কিটি কিটি শব্দকারী, নাসিকা ঊনপঞ্চাশ পবনের ক্রীড়াভূমি, বক্ষে যেন কুলকাঠের আগুণের হোম হইতেছে। যে মূর্ত্তিতে পূতনা, গোপ-বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহারার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন, এ মূর্ত্তি তদপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; যে মূর্ত্তিতে মহারাক্ষসী ভীষণবদনা ভীষণা, স-পাঞ্চালী-পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গপথ-গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, সে মূর্ত্তি আজ অতি কোমল কমনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র পতঙ্গ কিশোরী বাবু সে দাবানল-সদৃশ, অভ্রভেদীশিখ-মহাগ্নির নিকট যাইয়া কি বলিবেন?

তখন—কাতর, অশ্রুপূর্ণলোচন, ভয়চকিত-আনন, কম্পিত-বক্ষ কিশোরী কৃতাঞ্জলিপুটে, গললগ্নীবাসে, মধুসূদন নাম জপ করিতে করিতে সেই প্রলয়কর্ত্রী অগ্নিময়ী মহাদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরকোপানলে রতিপতি ভস্ম হইয়াছিল, কলিতে রতিকোপানলে বুঝিবা হর ভস্ম হয়। কিশোরী, মহাদেবী সুধামুখীর স্তব আরম্ভ করিলেন,—"হে অগতির গতি! কিশোরীর সর্ব্বস্ব,—যাঁর উদর পূরিলে কিশোরীর উদর পূর্ণ হয়, ক্ষুধায় ক্ষুধা, হাসিতে হাসি, ক্রন্দনে ক্রন্দন,—সেই দেবী আমার প্রতি আজ প্রসন্না হও, যাঁহার ইচ্ছায় সংসার চলে, অনিচ্ছায় সংসার লোপ হয়, যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ

চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী—সেই দেবী প্রসন্না হও ; যিনি চক্ষু বুজিলে ভুবন অন্ধকার, যাঁর কুটিলকটাক্ষে লোকপাল মূর্চ্ছিত,—যিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী—সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী—সেই দেবী কাতর কিঙ্কর, নাচার, বেচারা আমার প্রতি প্রসন্না হও। তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর, বিধাতার বিধাতা, অনন্তের অনন্ত, তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি রাহু—আমি তোমা বই আর কাহাকেও জানি না, হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হও।

ইতি দেবীস্তবমাহাত্ম্যে প্রথম অধ্যায়।

পুরুষ-রত্ন।

কালীকৃষ্ণবাবু স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসেন, উচ্চ শিক্ষা দিতে চাহেন, সভ্য করিতে চাহেন, কিন্তু হতভাগিনী স্ত্রী তাহা বুঝে না, স্বামীর উপদেশ শুনে না। স্ত্রীটে এমনি বোকা যে, প্রণয় কি, কিসে হয়, তাহা আজও বুঝিল না। কালিকৃষ্ণ বাবু সহচরগণের নিকট দুঃখ করেন, "আমার" উপযুক্ত স্ত্রী হইল না—এ জন্ম আমার বৃথা গেল।

কালিকৃষ্ণ নবীন বাবু, ইংরেজীতে কথা কন ; ইংরেজীতে চিঠি লেখেন ; ইংরেজীতে ভাবেন। কালিকৃষ্ণ লোকমুখে এমনও শুনিয়াছেন, তিনি ঘরে খিল দিয়া কথা কহিলেন, বাহিরের লোকের ঠিক ইংরেজের কথা বলিয়া ভ্রম হয়। ২৪ ঘণ্টা টেড়িকাটা, কিন্তু বিশেষ কসরত এই—রাত্রের টেড়ি, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরও, সেই একই ভাবে থাকে। সভ্য জাতির পোষাক অবশ্যই পরেন, কিন্তু এরূপ সভ্যতার পরা-

কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, হারমনকোম্পানীর বাটীর বস্ত্র ব্যতীত তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কষ্ট বোধ হয়। একদিন প্রতিবেশী-দরজী—মহম্মদ আলি অতি বিনম্রভাবে তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর! সাহেব বাড়ীতে কাপড় শেলাই আমার শেখা—আপনার কোট পেণ্টুলান্ যদি আমাকে ফরমাইস্ দেন, তাহা হইলে গরিব একমুঠা অন্ন করিয়া খায়।" এই কথা শুনিয়া হঠাৎ কালীকৃষ্ণ বাবুর শরীর ক্রোধে, ঘৃণায়, অপমানে থর থর কাঁপিতে লাগিল। নয়নদ্বয় জবাকুসুমের বর্ণ ধারণ করিল; অধিক কি—যেন বক্ষে শূলবিদ্ধ, ভগবতীপদদলিত মহিষাসুরের ন্যায় তীব্রলোমহর্ষণ আকৃতি হইল! গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "ক্যায়া তোম্‌সে হ্যাম্ কাপড়া লেঙ্গে?" এই বলিয়া চেয়ার হইতে বীরমূর্ত্তিতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার কথবার্টসেন ভবনের চর্ম্মপাদুকা শোভিত দক্ষিণ পদ, গরীব দরজীর ক্ষীণবক্ষে সজোরে পতিত হইল। দরজী পড়িয়া গেল। বাবু "কোোই হ্যায়?" বলিয়া মহাচীৎকার করিয়া উঠিলেন। চাপরাসী অমনি "খোদাবন্দ" হাঁকিয়া দৌড়িয়া আসিল। বাবু হুকুম দিলেন, "গর্দ্দান পাকড়কে ইস্কো নিকালো।" দরজী তখন অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "সাহেব! ম্যয়নে কেয়া কসুর কিয়া?" বাঙ্গালী-সাহেব "চুপরও" বলিলেন এবং চাপরাসীর প্রতি রক্তবর্ণ চক্ষুতে তাকাইলেন। চাপরাসীর তখন তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে দিতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। খলিফা, চাপরাসীকে, "ক্যায়া কসুর কিয়া?—এই কথা বিনীতস্বরে

বলিতে বলিতে চলিল। চাপরাসী বলিতে লাগিল "কেয়া জানে ভেইয়া!"

বাবু এইরূপে রুদ্রমূর্ত্তিতে অসুরদলন করিয়া মহাশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। উপযুক্ত অনুগত ভৃত্য এক গ্লাস সুধা আনিয়া সম্মুখে ধরিল। কিন্তু মহা সংগ্রামের পর সামান্য সুধায় কি হইবে? অমৃতের কলসী না হইলে, সে তৃষা ভাঙ্গে কি? ভৃত্য ইঙ্গিতে মনিবের নিদারুণ ক্লান্তি বুঝিয়া মনোগত কার্য্য করিল। বাবু এইরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া, চুরট-ধূমে গৃহব্যাপ্ত করিয়া, লণ্ডন-রহস্য নামক ইংরেজী কেতাব পড়িতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রাণের বন্ধু মোহিনীমোহন ঢুলু ঢুলু নেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটুকু অমৃতের জন্য দেবাসুরে সংগ্রাম বাধিয়াছিল, কিন্তু অদ্য কালিবাবুর মজলিস্ অমৃতময় হইয়া উঠিল। তখন মোহিনীমোহন বাবু বলিলেন, "What about the reformation? ছি! সকলি তোমার কথার কথা। কাযে কিছুই করিতে পারিলে না। You know reformation like charity, ought to begin at home!" কালি বাবু বলিলেন—"Oh that obstinate girl! the curse of my life! আমি কি করিব বল! স্ত্রী কি আমার কথা শুনে? নইলে আমার এত কষ্ট কিসের? তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিবে, তাহাতে আপত্তি কি ভাই?"

মোহিনী। আচ্ছা—সে বিষয়টার কি হলো?

কালী। সে কথা বলিলে, আরও সে ক্রুদ্ধ হয়। ভাই!

আমি একদিন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম, তুমি যদি এক ফোঁটাও মদ এক ছটাক জলে মিশাইয়া খাও, তাহা হইলে, এমন কি, আমি রাত্রে বেড়ান বন্ধ করি। কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতিকূল, সে সুখ এ পোড়া অদৃষ্টে ঘটিবে কেন? আমার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা হয়।

মোহিনী। "তুমি বড় কাপুরুষ! স্ত্রী-বশ করিতে পারিলে না হে! তোমার জীবনে ধিক্!—অথবা সমাজ-সংস্করণ কার্য্যে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। চেষ্টার, অসাধ্য কার্য্য আছে কি?"—"আন্তরিক ইচ্ছা নাই"—এই কথাটী কালি বাবুর হৃদয়ে বড় বিষম বাজিল, ক্রমে চক্ষে জল আসিল। ক্রোধে, ক্ষোভে বলিলেন—"আজ যেরূপে পারি স্ত্রীকে সভ্যতালোকে আনিব।"

তখন অতি ব্যগ্রচিত্তে স্ত্রীকে সংস্করণ করিতে উঠিলেন। বৈঠকখানা হইতে মস্ মস্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি নয়টার অধিক হয় নাই। কালি বাবুর স্ত্রী—সপ্তদশ বর্ষীয়া রমণী, নিজকক্ষে পালঙ্কে অধোবদনে বসিয়া আছেন; শয়নের সময় হইলেও শয়ন করেন নাই—একাকিনী ম্লানমুখে বসিয়া কি ভাবিতেছেন! চক্ষুকোণে জলবিন্দু। বালিকা-কালে পিতামাতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন—যাঁর চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখিলে, জনক জননী কাতর হইত, সে বাপ মা আজ কোথায়? সনাথিনী হইয়া আজ অনাথা! মহামূল্য পর্য্যঙ্ক, সুরঞ্জিত শয্যা, মনোহর অলঙ্কার, সুন্দর দীপালোক—সকলি মলিন। রমণী এক একবার অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় প্রতিদিন

কেন যে এ সব গহনা পরিতে বলেন, তাহা ত বলিতে পারি না।" এই বলিয়া কবরী হইতে সুবর্ণগোলাপ উন্মোচন করিলেন, গলদেশ হইতে হীরক-খচিত চিক খসাইতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় স্বামীর পাদুকাধ্বনি যেন সিঁড়িতে শুনিতে পাইলেন, একাগ্রচিত্তে কাণ পাতিয়া রহিলেন। এক একবার মনে করিতে লাগিলেন, এমন অসময়ে, এ রাত্রে তিনি কেনইবা এখানে আসিবেন? কিন্তু ক্রমে যখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন, স্বামীই বটেন, তখন অতি ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। কি বলিয়া যে স্বামীকে সম্ভাষণ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। রমণী-হৃদয় আহ্লাদে একটু দুলিয়া উঠিল। ঝটিতি—কেহ যেন দেখিতে না পায়, এই ভাবে সুবর্ণ গোলাপটী আবার পরিলেন এবং পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিলেন। এমন সময় পুরুষপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কালি বাবু, সহধর্ম্মিণীকে যেন ঈষৎ তুষ্টভাবে বলিলেন,—"মাই ডিয়ার ঘুমিয়েছ নাকি? তুমি জান, আমি তোমাকে কত ভাল বাসি! Thou the soul of my life! দেখ দেখি, তোমায় কত গহনা দিয়াছি? শীঘ্র উঠিয়া ব'স।" এই বলিয়া কালি বাবু নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন; স্ত্রী খাটের এক পার্শ্বে ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া বসিয়া রহিলেন। কালি বাবু বলিলেন, "ওকি, তুমি কথা কহিতেছ না কেন? আজ লজ্জা করিলে চলিবে না। লজ্জা আমি বুঝি না—তোমাকে শীঘ্র কথা কহিতে হইবে, আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারিব না।" স্ত্রী দেখিলেন, স্বামী সহজ নাই, কি করেন, ধীরে ধীরে, ভয়ে, ভয়ে অস্ফুট স্বরে কহিলেন "আমাকে কি

বলিবেন বলুন।" কালি বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন "তুমি স্বামী সম্বোধন করিতে জান না, তোমার Education বড় কম। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব।" রমণী আজ স্বামীকে যেন কিছু অনুকূল দেখিয়া একটু সাহস পাইয়া বলিলেন আপনি, কৈ আমাকে ত এক দিনও লেখাপড়া শিখিবার কথা বলেন নাই?" কালি বাবু বলিলেন, "না, তোমার তিলার্দ্ধও শিখিবার ইচ্ছা নাই; ইচ্ছা থাকিলে—আমার স্ত্রী হইয়া তুমি মূর্খ, তুমি অসভ্য হইতে না।" স্ত্রী তখন ভাব গতিক দেখিয়া একটু ভীত ও দুঃখিত হইলেন। কালি বাবু আরও বলিতে লাগিলেন—"তুমি আমার স্ত্রী হইয়া আজও সে সুরার গৌরব বুঝিলে না, ইহাই আমার দুঃখ—সাহেবদের দৃষ্টান্ত তুমি কি দেখ নাই? নীরব থাকিও না, স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দাও।" স্ত্রী তখন নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন; বুঝিলেন বিধাতা নিশ্চয় বাম হইয়াছেন;—চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীকে নাছোড়বন্দ দেখিয়া অবনতবদনে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমি আর আপনাকে কি বলিব?"—স্বামী তখন একটু ক্রোধ এবং ঘৃণা দেখাইয়া বলিলেন—"Nonsense! তুমি স্বামীর কথা শুনিবে কি না?—তোমার Education চাই। মোহিনী বাবু তোমার শিক্ষক হইবেন; তাঁহার সহিত তোমার আজ আলাপ করাইয়া দিব, তিনি তোমাকে রোজ এক ঘণ্টা পড়াইবেন। তিনি যখন আমার bosom friend, তখন তোমারও bosom friend"। এই কথা শুনিয়া স্ত্রী বড়ই কাতর হইলেন; বুঝিলেন, আবার সেই সর্ব্বনেশে কথা

উঠিয়াছে,—ভয়ে প্রফুল্ল-মুখ-কমল একেবারে বিশুষ্ক হইয়া গেল অতি মৃদুস্বরে, বিনয়ে, অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন— "আমাকে রক্ষা করুন, ইহা ছাড়া আপনি যা আমাকে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

কালি বাবু বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ হোঃ, তুমি তোমাদের শাস্ত্রে অবশ্য শুনিয়াছ—স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ। Dont' you remember about a mouth ago তোমার হস্তে একগ্লাস ব্রাণ্ডি দিয়াছিলাম; তুমি স্বামীর অবমাননা করিয়া স্বামীর সাক্ষাতে তাহা ভূতলে ফেলিয়া দিলে— a downright insult! কোন অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র স্বামীর হস্তে পড়িলে, সেই দিনই উত্তম শিক্ষা পাইতে; আমি বলিতেছি, তোমার নরকেও স্থান নাই। তুমি এডুকেশন পাও নাই—সুরার মর্ম্ম কি বুঝিবে? ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছি, ব্রাণ্ডি ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র প্রণয় জন্মে না। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া, ফ্রেণ্ড মোহিনীর সহিত কথা কহাইয়া তোমাকে এডুকেশন দিব। তুমি সহজে না আস, বলপূর্ব্বক বাহিরে লইয়া যাইবার আমার অধিকার আছে। উঠ, চল, বন্ধু-মোহিনীর কাছে চল।—এই বলিয়া স্ত্রীর নিকট ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্ত্রীর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল, কেবল ধীরে ধীরে, করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন।"

এদিকে কালিবাবুর গলার গভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়া ভগিনী লক্ষ্মী দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে

বলিতে লাগিল, "বউ কাঁদচো কেন? কি হয়েছে?" এমন সময় বৃদ্ধা জননী গুটি গুটি আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বাবা কালি, বৌমাকে কি এমন করিয়া মারিতে হয়? ছি! বাবা, লোকে শুনিলে বলিবে কি?"

কালিকৃষ্ণ-বাবু উত্তর করিলেন—মাতা, তুমি কিছুই বুঝ নাই; আমি সমাজ-সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বঙ্গের দুর্দ্দশা দূরীকরণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু ভগবানের সেরূপ ইচ্ছা নহে—O it will take centuries to reform your country.—What can a Cato do against a base degenerate world!'

বৃদ্ধা, কন্যাকে বলিল, "লক্ষ্মী। একটু জল আনিয়া শীঘ্র বাছার মাথায় দাও।"

কালিবাবু অবশেষে "Alas my country!" এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বন্ধু মোহিনী বলিলেন—"Quite discomfited? Cheer up my good old fellow! persevere and you will succeed."

বঙ্গের ভরসা।

এসব কথা বলি কাকে? এ দুঃখের কথা শুনেই বা কে? আমার এক জন প্রতিবেশী বন্ধু মাতাল হইয়া উঠিল। জানিতে পারিয়া আমি তাহাকে ভৎর্সনা করিলাম, সেদিন সে চুপ করিয়া রহিল। আর এক দিন পউদেশ দিতে গেলেম, সেদিন সে আর নীরবে না

থাকিয়া বলিল, "আমি অর্থহীন, লেখাপড়া কম জানি বলিয়াই কি এত লাঞ্ছনা দিতেছেন? আপনার আশে পাশে আমা অপেক্ষা যে দুরন্ত অপরাধে অপরাধী রহিয়াছে, সে মহাপাপীদের সহিত আপনি হাসিয়া কথা কন কেন? কৈ তাহাদিগকে ত একদিনও একটী চড়া কথা বলেন নাই?—তবে আমি দরিদ্র সন্তান, টো টো করিয়া বেড়াই বলিয়াই কি আমাকে গালি দেওয়া আপনার সহজ? আপনার যত রোখ্ সবই কি আমার উপর?" আমি নিস্তব্ধ. উত্তর দিতে পারিলাম না, ভাবিলাম কথা ত বড় মিথ্যা নয়। "পাড়ার নবদুর্ব্বাদলশ্যাম—নবীন নাগর গুণের সাগর, ধর্ম্মের আকর সেই গোপিনীমনোমোহন সুরাসেবনে আজ বুদ্ধিহীন, কর্ম্মকাণ্ড বিহীন, - যাঁর অর্দ্ধাঙ্গী সহধর্ম্মিণী গৃহের ক্রীতদাসী অপেক্ষাও অধম, যাঁর গর্ভধারিণী জননী কাঠকুড়ানী অপেক্ষাও ম্লানমুখী, সেই কুলাঙ্গার পুরুষের সহিত পথে দেখা হইলে, তুমি তাহার সেই পাপপঙ্কিল হস্তে হস্ত দিয়া, "সেকেণ্ড" কর কেন?—সেই দুরাচার ২।৪ টা পাস করিয়াছে বলিয়া কি?—না, মাসে ২।৪ শত টাকা রোজগার করে বলিয়া? তখন কি তোমার ঘৃণা বোধ হয় না? তোমার যত বাক্পটুতা গরিবের কাছে?"

সমাজের উচ্চস্থানীয় লোক—কৃতবিদ্য, এবং ধনবান্ ব্যক্তি, কোথায় উপদেশ দিয়া, নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জনসাধারণকে সৎপথে আনিব,—কিন্তু তাহা না হইয়া, আজ তদ্বিপরীত ঘটিতেছে। কবি, উপন্যাস-লেখক, ডেপুটী,

উকীল, জমীদারপুত্র ইত্যাদি—ইহাঁদের অনেকেই পাপ-স্রোতে—মত্ততায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন। কবি বলিয়া থাকেন—“সুরাপান না করিলে, সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অপরা স্ত্রীতে অনুরক্তি না হইলে, প্রকৃত কবিত্ব খোলে না।—পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ কর, ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। সেক্ষপিয়র, বাইরণ, ভাল্টেয়ার, রুসো, মাইকেল কি ছিলেন?” ছি! এ সব লোকের সঙ্গে কি তর্ক করিতে আছে?

এক দিন কোন এক সম্প্রদায় সুপণ্ডিত লোকের মজলীসে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে দেখিলাম, এক বৃহৎ টেবিল; তদুপরি সুস্বাদু, সতেজ, নিস্তেজ, দ্রবময় পদার্থপূর্ণ—নীল, পীত, লোহিত রঙের বোতল। তৎপার্শ্বে রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে কট্‌লেট, চপ, রোষ্ট। মাতালগণ গ্লাসে সুধা ঢালিতেছেন,—বক্ষ, হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া অশ্লীল গল্প করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে স্বদেশানুরাগের কথার ঢেউ উঠিতেছে; বলিতেছেন, দেশে লোকশিক্ষার প্রচার চাই, জয়েণ্টষ্টক-কোম্পানী করিয়া দেশে কাগজের কল, কাপড়ের কল, দিয়াশিলাইয়ের কল চাই; দেশে কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া চাই। এই কথা বলিতে বলিতে আবার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া বদন-সুধাকরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তেজ চড়িয়া উঠিল, ধমনীতে আর্য্যশোণিত দ্বিগুণতর বেগে বহিতে লাগিল, একজন বলিয়া উঠিলেন—দেশউদ্ধার কথায় হইবে না, কার্য্য চাই কার্য্য চাই। তখন সভা হইতে ব্রেভো ব্রেভো, শব্দ উত্থিত হইল। আবার সেই রোগশোক-বিনাশিনী, চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী ব্রাণ্ডি মহাপাত্রে ঢালিত

হইয়া সকলের উদরে গিরিগহ্বরে নিহিত হইল; "কথায় আবশ্যক নাই—কার্য্য চাই কার্য্য চাই" সকলে এই বুলি ধরিলেন,—অবিরাম অবিশ্রান্ত, শ্রাবণের বারিধারার ন্যায়—"কার্য্য চাই"—এক প্রহর কাল কেবল এই শব্দ। অনন্তর মাতালগণ মহাবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে ধরাশায়ী হইলেন।

আর এক দিন মনে পড়ে।—একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী স্থানান্তরিত হইলেন। নগরের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য লোক বাগানে ভোজ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবেন স্থির করিলেন। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, সেই প্রীতি-ভোজনের প্রধান আয়োজনই—সুরা এবং বারবনিতা। যাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি হইত, যাঁহাদের কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইত, সেই নাগরিক মহোদয়গণের মদবিহ্বল দেহ, জড়ীভূত ভাঙা ভাঙা কথা দেখিয়া শুনিয়া সেদিন তাঁহাদিগকে পিশাচ অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হইল। যাঁহারা দেশের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া ভাণ করেন, খোলাভাটীর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া যাঁহারা প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা করেন, জনসাধারণ যাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে চাহে, সেই উচ্চপদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত লোকের দশা যখন এইরূপ হইল, তখন আর কাহাকে কি বলিব? রামধন তাড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া দুঃখ করিলে কি হইবে, এদিকে যে তোমার শ্রীনীলকণ্ঠ—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন, ভারতমাতার আশা শ্রীনীলকণ্ঠ—এক্‌সা-নং-ওয়ান টানিয়া পড়িয়া আছে, মুখে মাছি ভন ভন করিতেছে, তাহাকে তুমি দেখিতে

পাইতেছ না? তাই ভাবি, এ দুঃখের কথা বলি কাকে? খোলাভাটীতে নিম্নশ্রেণীর লোক বহিয়া গেল, ব্রাণ্ডিতে উচ্চ-শ্রেণীর লোক মাতিয়া গেল—দেশ ক্রমে আরও নীচে বসিতে লাগিল। যে কয়জন সাধু আছেন, কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহাদের কোন্ দিন যে কি বিপদ ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সাধু-গণের উচিত মাতাল—ধনবান্ বিদ্বান্, ক্ষমতাশালী হইলেও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা না কওয়া, তাহার উপর বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করা, সেই পামরের মুখপানে তাকাইলেও পাপ হয়—এরূপ বিবেচনা করা। সামাজিক দৃঢ়-শাসন না থাকিলে, মাতলামীর শাসন হইবার সম্ভাবনা নাই।

পত্নীভক্তি।

"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম"—এই কথা বলিয়া, বিবাহ করিয়া আনিয়াছি বলিয়া, আমি কিছু আর চোরের দায়ে ধরা পড়ি নাই; স্ত্রীকে বিবাহ করিতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াগিয়াছে, আমার ঘরে আজীবন খাটিলেও, তাহার সে ঋণের এক অংশও শোধ যায় না। তাই বা বার মাস ঘরে থাকে কই? মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ি গিয়া কামাই করা আছে। কিন্তু ঘোর কলি উপস্থিত, স্ত্রীলোক বেইমান; এত যে উপকার করিলাম, তাহার কিছুই মানে না, বুঝে না। আমি না বিবাহ করিলে তাহাকে এতদিন হয়ত আইবড় থাকিতে হইত, সে কথা মনেও ভাবে না। এত অর্থ ব্যয় করিয়া, ঘরে আনিয়া, দুবেলা নিয়মিত খোরাক দিতেও ত্রুটী করি নাই, বৎসরে দু জোড়া কাপড়,

দুখানা গামছা, রোজ তেল জলখাবার এক পয়সা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছি, তথাচ আমার যশ নাই, সদাই আমার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন। স্ত্রীর বলিবার যো নাই—যে, খাবার মাখিবার কষ্ট হয়, নিজে পাক করেন, নিজেই ভাত বাড়েন। একজন আলাপীর নিকট বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, নিজের জন্য চাপিয়া চাপিয়া ভাত বাড়িয়া তাহার মধ্যে মাছ লুকাইয়া রাখেন, অবশেষে আমাকে ভাত দেন। আমি এসব কথা ধরি না; গায়ে মাখি না, মনে করি, অনেক দিন বাড়িতে আছে, থাক্,—কত কম্‌নে যায়! আর এখন ত্যাগ করিলেও লোকশান, বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে।

কিন্তু ভালোর ভালাই নাই; আমি যত নরম হইতেছি, সে তত গরম হইয়া উঠিতেছে। কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে, ক্রমে সে মাথায় উঠে—ইহা শাস্ত্রের লিখন। সদাই থন্ থন্ ঝন্ ঝন্। রাত্রে বেড়াইয়া আসিতে একটু দেরি হইলে, অমনি আমার উপর চক্ষু রক্তবর্ণ করা হয়, ডাকিলে উত্তর দেওয়া হয় না, আপনার গরবে সদাই গস্ গস্। বলি, আমার ঘরে থাকিয়া, আমার খাইয়া, আমার টাকা নষ্ট করিয়া, আমারই উপর রাগ? আমার কথায় অবহেলা? না বেড়াইলে স্বাস্থ্য থাকে কি? আর যদিই আমি কোন দিন রাত্রে ঘরে না আসি, তাহাতে উহার ক্ষতি কি? তাহাতে উহার লাভ বইত লোকসান নাই? আমার ভাত, ডাল মাছ তরকারি এবং উহার নিজের অন্নব্যঞ্জন—এই উভয়ের

অন্ন, একলা খাইতে পাইবে। আর গ্রীষ্মকালে এই সুবিস্তৃত শয্যায় সটান হইয়া একলা শয়ন করিতে পাইবে। অগ্নি সম্মুখে, বলিতে পারি, একদিনও আমার অন্নব্যঞ্জনের জন্য আপত্তি করি নাই। স্ত্রীর গুণের কথা অধিক আর কি বলিব? রাত্রি একটার সময় আমি এক দিন বেড়াইয়া ঘরে এলাম, সে দিন বড়ই কষ্ট পাইয়াছি, ক্ষুধার লেশমাত্র নাই, বলিলাম ভাত খাইব না; কিন্তু স্ত্রীটা এমনি দুষ্ট-বুদ্ধি—আর আমাকে জ্বালাতন করা তাহার জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য—সে বারম্বার আমাকে বলিতে লাগিল, "ভাত খাও, ভাত খাও।" আমি যত বলি খাব না, সে তত বলে "খাও খাও!" আমার রাগে সর্ব্বশরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল, দক্ষিণ হস্তে বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিলাম, বলিলাম—"রে যন্ত্রণাদায়িনি! আমার হাড়-কালিকারিণি! ফের যদি আমাকে খাইবার কথা বল, তবে এই বজ্রমুষ্টি তোমার নাসিকাগ্রে পাতিত হইবে।" তখনও নিস্তার নাই, ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই,—মন্দমতি স্ত্রীটা তখন "খাও খাও" ছাড়িয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল, যেন কালসাপিনী গর্জ্জাইতে লাগিল। এইবার সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করুন,—আচ্ছা, আমি মুটাটী উঁচাইয়াছি মাত্র, মারিয়াছি কি? সুতরাং অবশ্যই নাকে আঘাত লাগে নাই, তবে কাঁদে কেন?—কেবল আমাকে রাত্রে ঘুমাইতে দিবে না বলিয়া। ক্রমে মিহি বাজখেঁয়ে নাকি সুর ধরিলেন, যেন ঝিঁঝি পোকা ডাকিতে লাগিল।

আমি গতিক দেখিয়া বলিলাম, "তুমি ঘরে বোসে অমন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে পারিবে না, বাস্তুভীটায় চোখের জল ফেলিলে অকল্যাণ হবে, সদর রাস্তায় যাও।" মহাশয়, বলিব কি?—তথনও উঠে না, আমি কি করি, হাত ধরিয়া বাহির করিয়া খিড়কির দ্বারে খিল দিয়া আসি, তবে সে রাত্রি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি। স্ত্রীটার জ্বালায় এক এক দিন ইচ্ছা হয়, আগে ওরে মারিয়া, তার পর আমি ফাঁসি যাই। সকলে দেখুন, স্ত্রী আমার স্বাধীনতা লোপ করিতে চাহে, ভ্রমণে বাধা, আহারে বাধা, অনাহারে বাধা, এত অন্যায় কে সহে? যে স্বাধীনতার জন্য আমেরিকায় রুধিরের নদী বহিয়াছিল, যে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ তাহাদের দু তিনটা রাজাকে হত্যা করে, স্ত্রী সেই পবিত্র উচ্চ স্বাধীনতা লোপ করিতে চাহে। কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র যেমন মন্দ হউক না কেন, আমি ত তার সম্পর্কে স্বামী, সেই সকল সহ্য করিয়া থাকি। একদিন স্ত্রীর বালিশের নীচে একখানি লুক্কায়িত পুস্তক (বোধোদয়) দেখিতে পাইলাম, আমি অধিক ভৎর্সনা না করিয়া কেবল বলিলাম "খবরদার, স্ত্রীলোকের পুস্তক পড়িতে নাই, আর যদি এ ঘরে কোন পুস্তক দেখি, তবে তোমার রাত্রে দুই দিন আহার বন্ধ করিয়া দিব। কিন্তু স্ত্রী এরূপ দুষ্ট যে, আমার উপদেশ না শুনিয়া, আমার কথায় 'হঁা' কি "না" জবাব না দিয়া, কেবল গোঁজ হইয়া, মুখ হেঁট করিয়া রহিল। যাহা হউক, এক রকম ক্ষমা ঘৃণা করিয়া আমি দিন কাটাই-

তেছি; তবে দুঃখ এই, আমার যেমন মন, তার তিলার্দ্ধও যদি স্ত্রীর মন হইত, তবে সংসার কি সুখের হইত। আমার স্ত্রীকে সুমতি দিবার উপায় কেহ বলিয়া দিতে পারেন? আমি কিছু টাকা খরচ করিতেও প্রস্তুত আছি,—যদি স্ত্রীটী আমার বশ হয়। আহা! অপরের স্ত্রী দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; কেমন আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কেমন মধুর-হাসিনী; তারা কেমন আধ আধ-অমৃতমাখা ভাষায় কথা কয়, কাছে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না; আর আমার স্ত্রী সর্ব্বদাই বিশ্বম্ভর মুখে বসিয়া আছেন—রাঙাপদে যেন কত অপরাধই করা গিয়াছে। সকলের বিবাহে একই মন্ত্র, একই অর্থ ব্যয়, কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই বিপরীত ফল ফলে। আমি ধন্য দয়াশীল পুরুষ, তাই এখনও এরূপ কালসাপিনী স্ত্রীকে ঘরে রখিয়াছি।

হঠাৎ কবি।

দিব্য করিয়া বলিতে পারি, যদি আমি দুই মাসের অধিক ঘর ছাড়িয়া পশ্চিম-প্রদেশে আসিয়া থাকি। ইহার মধ্যেই একটী বড় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার মন, যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত হইল। আমাদের প্রতিবেশী গোবর ভায়া হঠাৎ প্রকৃত কবি হইয়া উঠিয়াছেন। সংবাদপত্রে মাসিকপত্রে সর্ব্বদাই এই রকম দেখিতে পাই;—"শ্রীগোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী প্রকৃত কবি, জলন্ত কবি, উর্দ্ধগামী কবি: ইহাঁর বাক্যসুধারসপানে মুনিঋষি-

যোগীরও হৃদয় বিচলিত হয়।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মন বড় চঞ্চল হইল, রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না, কেবল ভাবি, গোবর ত সেই, সারাদিন ফিক্ ফিক্ হাসে, চেরাসিঁথিটি কাটে, আর মিহি কাপড়-খানি পরে; সে গোবর এই অল্প দিন মধ্যে কবি হইল কিসে? গোবরের ত গুণের মধ্যে বার দুই তিন এণ্ট্রেন্স ফেল, আর প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা গল্প করা, এবং রাজা বাদ্‌সা মারা। গোবর না পড়ে পণ্ডিত হোলো, আমরা পড়ে শুনেও কিছু করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইল সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গোবরকে যাইয়া একবার দেখিব—একবার নয়ন ভরিয়া আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিব। পরদিনই অমনি ডাক গাড়ীতে রওনা হইলাম; শীঘ্রই বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম; স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথা নাই বার্ত্তা নাই, হঠাৎ আসার কারণ কি?' আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না, বলিলাম "আসিতে কি নাই?" মা জিজ্ঞাসা করেন "বাবা শরীর গতিক ভাল আছেত? চাকরীরত কোন গোলমাল হয় নাই?" বন্ধু বান্ধবগণ বলিলেন—"এবার যে খুব ঘন ঘন বাড়ী আসি-বার ধূম দেখিতেছি।" আমি কাহাকে কি উত্তর দিব কিছুই স্থির করিতে পারি না; ঘোর বিপদে পড়িলাম, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সব সারিলাম।

বন্ধুদের সহিত ঐ, ও, তা গল্প করিতে করিতে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোবর কেমন আছে?" তাঁহারা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কি শুনেন নাই,

গোবর্দ্ধন বাবু সম্প্রতি নট-নিকুঞ্জ নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন? আজ কাল তাঁহার নিকট অনেক বড় লোকের চিঠি আসিতেছে; সকলেই তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেছেন। আমি বলিলাম, "বল কি হে? — গোবর একদিনে কবি হইল কিরূপে?„ তাঁহারা বলিলেন,— "সত্য সত্যই গোবর্দ্ধন কবি হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" আমি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম। বন্ধুগণ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আপনি হাসিবেন না, গোবর্দ্ধন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, আপনার ভ্রম দূর হইবে।

আমি গোপনে গোবরের আরও কিছু সংবাদ লইলাম; কিন্তু সকলেই বলেন, গোবর কবি হইয়াছেন। শুনিলাম, তিনি এখন সর্ব্বদাই নীরবে থাকেন, কেবল একমনে ভাবেন, সঙ্গে কথাও কন না, লোকও ভাল ঠাওরাইতে পারেন না, কাহারও সঙ্গে যদিই কথা কহিতে হয়, তবে পদ্যে কথা কন,—গদ্য আর মুখ দিয়া উচ্চারণ হয় না। গোবরের সঙ্গে দেখা করিবার লালসা ক্রমশই বলবতী হইতে লাগিল; দশটার মধ্যে আহার করিয়া তাড়াতাড়ি গোবরের ভবনে গেলাম। দেখিলাম, দ্বারে চাপরাসী; আমি কিছু না মানিয়া ঘর ঢুকিতে যাইতেছি, চাপরাসী ছাড়িবে কেন? সে কার্ড চাহিল। আমার ত সে সব কিছুই নাই,—চাপরাসীকে বলিলাম, "বাপু হে! অনেকদূর হইতে আসিয়াছি, একবার দ্বার ছাড়িয়া দাও। দ্বারী তথাচ দ্বার ছাড়ে না। হাঁকাহাঁকি করিয়া যে

গোবরকে ডাকিব, তাহারও যো নাই, চাপরাসী বিকট চক্ষে কেবল বলিতেছে, 'আস্তে, আস্তে বাবু।' অবশেষে কিছু বুদ্ধি খরচ করায় সহজেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। গৃহে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব অননুভূত বটে। দেখিলাম, একটী মনুষ্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে, চক্ষের পলক পড়িতেছে কি না, সন্দেহ ; কলেবর শ্বেত-বস্ত্রমণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে পেনসিল, বাম হস্তে কাগজ। রূপ দেখিয়া প্রথমে সেই নিশ্চল মূর্ত্তিকে স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই ; ক্রমে বুঝিলাম, আমাদের গোবর্দ্ধনই বটেন। গোবরের রংটা খাঁড়ি মুসুর ডেলের মত; আজ কাল আবার খুব মাজা, ঘসা ; চেহারা একহারা, গোঁফের রেখা উঠিয়াছে মাত্র,—চুল লম্বা, তাহাতে চেরা সিঁথি—পটলচেরা চক্ষের চাহনী কেমন কেমন,—কাযেই প্রথমে নারীজাতি বলিয়া ভ্রম হয়। যাহা হউক, ক্রমে গোবরের সম্মুখে গিয়া বসিলাম, তখনও গোবর নীরব ; আমিও সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিতেছি না, কি জানি, যদি কোন মহাধ্যান ভঙ্গ হয়। প্রায় ৮।১০ মিনিট পরে, গোবর আমার পানে চক্ষু ফিরাইলেন, খানিক চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা নাকী সুরে বলিতে লাগিলেন ;—

কে তুমি, কি নাম তব, নিবাস কোথায় ?
কিবা প্রয়োজনে বল হেথা আগমন ?
প্রাণ দিয়া, দেহ দিয়া, করিব উদ্ধার
তব কার্য্য ; ইথে কভু নাহিক অন্যথা।

যথায় দধীচি মুনি দেহ অস্থি দিয়া
উদ্ধারিল দেবগণে, মারি বৃত্রাসুরে।

গোবরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমিত অবাক্ ; ভাবিলাম ব্যাপারটা কি ? বলিলাম "ভায়া আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?—চিরকাল এক সঙ্গে বেড়াইয়াছি, ছেলেবেলায়, যে "দেবেন দাদা" তোমায় মানে বলিয়া দিত, আমিই সেই দেবেন্দ্র।

ওঃ হো, বুঝিয়াছি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ তুমি,
রাজীবের বংশ তুমি করেছ উজ্জ্বল ;
তুমি মম বালবন্ধু ; সখে ! বল দেখি
হাত ধরাধরি করি দুজনে মনের সুখে,
খেলিতাম কত খেলা ভাগিরথী তটে,—
কপোত কপোতী যথা,—জাহ্নবী সলিল
যবে মাখিত জোছনা উলটী পালটী।

তখন আমি আর থাকিতে না পারিয়া ভায়াকে সকল কথা ফুটিয়া বলিলাম—"গোবর ! তুমি কেবল অমন কবিতা আউড়াইতেছ কেন ?—সোজাসুজি কথা কওনা—গোবর উত্তর করিলেন,

গদ্যপদ্য ছন্দোবন্দ কিছু নাহি জানি,
দেবী কৃপা সব,—যা বলান, তাই বলি।
বাক্‌দেবী বীণাপাণি, বীণার ঝঙ্কার
হৃদয় কমলে মম দিতেছে সতত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোবর ! কবে হইতে তোমার কবিত্ব শক্তি জন্মিল ? গোবর উত্তর করিলেন,

চিরদিন ছিল কবিত্বে শক্তি,
চিরদিন ছিল কবিত্বে ভক্তি,
(তবে) এত দিন ছিল ধরিয়া মরিচা,
ভূগর্ভে হীরক না রহে সাঁচা।
এখন ডেকেছে কোটালে বান,
খরনদী অতি তরঙ্গ তুফান,
আগে ভেসে যায় যার ব্রহ্মাণ্ড-বাগান।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, ভাই গোবর! তোমার কবিত্ব কেবল কি মুখে?—কাগজ কলমে হয় কখন? গোবর বলিলেন, ...

দেখ তবে রাজীব-বংশ-ধুরন্ধর।
কবিতা লিখি কত মনোহর॥

এই কথা বলিয়া তিনি ভাল কাগজ ও কলম লইলেন; দোয়াতটী সম্মুখে সরাইয়া আনিতে গেলেন,—দুর্ভাগ্যক্রমে দোয়াত আনিবার সময় হঠাৎ আমার নূতন ইস্ত্রীকরা পিরিহানে কালি পড়িয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিতেছি, কি গ্রহ, কি উৎপাত, ব্যস্ত হইয়া কালি পুঁছিবার উপক্রম করিতেছি,—কিন্তু কবিহৃদয় অমনি উথলিয়া উঠিল, গোবর বলিলেন,—

আহা কি সুন্দর শোভা পিরাণ উপর
সৌদামিনী কোলে যথা নবীন নীরদ;
বকশ্রেণী মাঝে কাকের সঙ্গতি মরি!
অথবা যেমতি সাদা-কৃষ্ণ-বক্ষে, কালো-ভৃগু-
পদচিহ্ন;—মুনিমনোহর নয়নরঞ্জন।

গোবরের কার্য্য দেখিয়া আমার মনে হাসি, দুঃখ, বিস্ময় একেবারে উদয় হইল। বেলা দুইটা বাজে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি; এমন সময় গৃহ-দাসী আসিয়া বলিল, "দাদা বাবু, বেলা অনেক হইয়াছে, মাঠাকরুন এখনও ভাত খেতে পান নাই, আপনি শীঘ্র আসুন,—গোবর উত্তর করিলেন,—

যাও দাসী ধীরে ধীরে মন্থর গমনে;
পার্থিব মাতাকে বল—"ভাত খাবো না।"

দাসী কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। গোবরের জননী শুনিলেন ছেলে ভাত খাবে না; বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিনপ্রহর বেলা, না খেয়ে পিত্তি পড়ে একটা ব্যারাম কর্‌বে, আজ ক দিন থেকে সদরে চুপ করে ঘরের কোণে থেকে তার যে কি হচ্চে, কিছুই বুঝিতে পারিনে। যাই আমি একবার। এই বলিয়া বৃদ্ধা বহিরে পুত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। দাসী বলিল, সে ঘরে ওবাড়ীর ছোট বাবু আছেন। বৃদ্ধা বলিল, সে আমার পেটের ছেলের মত, থাকুক। জননী কিছু উগ্রস্বভাব; কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে বলিলেন—"বলি গোবরা, ভাত খেসে না—তুই কি মনে করেছিস্ বল্ দেখি?—গোবর তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোড়হস্তে বলিলেন—

এস মাতঃ জগদম্বে! শক্তিরূপা তুমি,
প্রণতি তোমার পদে করি বার বার।

মাতা বলিলেন—"ভাত খেসে আয়, পাগলের মত বকিতে হইবে না।"

গোবর। ক্ষুধার নাহিক লেশ; কবিতা অমৃত
পানে সদা সিক্ত প্রাণে,—মৃত্যুঞ্জয় আমি।
কি আর পার্থিব অন্ন—ধানের প্রপৌত্র
তারে—খাব আমি? মাতা ফিরি যাও ঘরে,
দাসেরে গো মা রেখো মনে—এ মিনতি তব পদে।

মাতা বলিলেন, "তুই কি সত্য সত্যই পাগল হলি নাকি?" এই বলিয়া যেন কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য দ্রুত গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গোবর, মাতার প্রণামবন্দনা করিতে লাগিলেন,—

কজ্জল পূরিত লোচন ভারে,
স্তনযুগ শোভিত মুক্তা হারে—

এমন সময়ে বৃদ্ধা জননী এক কলসী জল আনিয়াই গোবরের মাথায় তাড়াতাড়ি ঢালিয়া দিল,—বলিলেন, এত-খানি বেলা, তবু স্নান নাই—কাযেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে, বাছা তাই বেছুট বকিতেছে। দাসীকে বকিলেন—মাথায় শীঘ্র বিষ্ণুতৈল দাও। তখনও নিস্তার নাই; গোবর বলিতে লাগিলেন;—

কিবা মনোরম সলিল প্রপাত!
হেরেছি গোমুখী-গণ্ডে জাহ্নবী পতন,
হেরি নাই কভু এহেন জলের ঢেউ॥

এইরূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল। আমি খুড়িকে বলি-লাম—"তিন মাস কাল বিষ্ণুতৈল মাখান ও প্রাতস্নান করান চাহি—এই বলিয়াই চলিয়া আসিলাম।

বিবাহ-রহস্য।

১ম বৈরাগ্য।

কামিনী বাবুর ক্রমে বয়স হইয়া উঠিল; তিনি ইংরেজী পড়েন, টেড়ি কাটেন, পমেটম্ মাখেন, বক্তৃতা দেন, গান করেন। তিনি আবার খুব ভাল ছেলে; প্রতিবেশিগণের মতে অঙ্কশাস্ত্রে আর একটু অধিক ব্যুৎপন্ন হইলে, তিনি এতদিনে সব কয়টা পাসই করিতে পারিতেন। এরূপ গুণ-ময়, জ্ঞানময় ছেলের দেখিতে দেখিতে ক্রমে ১৮ বৎসর হইয়া উঠিল। আর কি বিবাহ না দিলে সাজে? কামিনী বাবুর পিতাকে সুহৃদ্বর্গ বুঝাইতে লাগিলেন,—"মহাশয়! করিতেছেন কি? পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, বিবাহের কাল বহিয়া যাইতেছে—আপনারও পৌত্র-মুখ দেখিবার সময় উত্তীর্ণ হইতেছে, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।" পিতা বলিলেন—"কামিনীর আমার, ইংরেজী পড়ে কেমন এক-রকম মেজাজ হইয়াছে; শুনিয়াছি, সে এখন বিবাহ করিতে চাহে না,—সে রাজি থাকিলে কি এতদিন বিবাহ বাকী থাকিত?" সুহৃদ্গণ উত্তর দিলেন,—"আজকাল ছেলে পিলের ঐ কেমন একরকম কথা হয়েছে,—আপনি সাবধান হবেন, এখন বিবাহ না দিতে পারিলে, বোধ হয় আপনি আর কখনই দিতে পারিবেন না—বাঁশ কাঁচা বেলায় না নোয়াইলে, পাকা বেলায় আর নোয়ান যায় না।—আমরা আপনার অনেক কালের বন্ধু, তাই এত কথা বলিতেছি।"

কামিনী বাবু দিব্য নব্য ছোকরা, ফুটফুটেটী, ঠোঁট দুটী লাল,—যেন আলতা দেওয়া, হাতে একখানি গোলাপী রঙের রুমাল, ঘাম থাক বা না থাক,—সদাই তা দিয়া মুখটী মুছিতেছেন। জনসমাজে প্রচার ছিল, কামিনীবাবু বিবাহ করিবেন না। তিনি একবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, অল্প বয়সে বিবাহ করা বড় দোষ, সন্তান দুর্ব্বল হয়, পবিত্র প্রণয় জন্মে না, আর স্ত্রীপুরুষ দীর্ঘজীবী হয় না। লোকে বুঝিল, কামিনী বুঝি সন্ন্যাসী হইবেন; বংশ লোপ, পিতার নাম লোপ করিবেন। কিন্তু কামিনীকুমার অতি মিহি কালাপেড়ে ধূতি না হলে পরিতেন না, মাথাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া চেরা সিঁথি কাটিয়া পেটো পাড়িতেন,—কখনও নয় আনা-সাত-আনা ভাগ হইবার যো থাকে নাই। তার উপর গন্ধ দ্রব্যের ছিটা দিতেন; রোজ একখানি সুগন্ধি সাবান করপদ্ম সংঘর্ষণে ক্ষয় হইত, বিদ্যাসুন্দরের ভাল ভাল স্থান খুঁজিয়া পড়িতেন; দুষ্ট লোকে এমনও কণাকাণি করিত যে, কামিনী সন্ধ্যা ও সকালে লুকাইয়া বাসরঘরের গানের আখ্ড়া দিতেন। লোকে যা বলে বলুক, কামিনী কিন্তু বিবাহের নামে শিহরিয়া উঠিতেন, বলিতেন,— "ছি! ও পাপ কথা আমার কাছে কহিও না?" কামিনী বাবুত সমাজ সংস্করণের জন্য, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য বিবাহ করিবেন না বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু ওদিকে তাঁহার পিতা মাতার দুঃখের অবধি নাই,—হায় হায়! ছেলেটা কি হলো? এমন জানিলে কে তাহাকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিত?—সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ অধিক

মায়ের। তাঁর খেতে শুতে, উঠিতে বসিতে, কিছুতেই সুখ নাই। ম্লানময়ী অধোমুখে বসিয়া আছেন,—এমন সময় পাড়ার পক্ক-কেশা, গলিত-দশনা, বৃদ্ধ-প্রপিতামহী আসিয়া উপস্থিত। তিনি পাড়ার সর্ব্বময়কর্ত্রী, বিধান-দাত্রী; দশখানা গ্রামের লোক তাঁহার স্বকৃত শাস্ত্রানুসারে চালিত হয়; নবদ্বীপ, কাশী, কাঞ্চীর শাস্ত্রসঙ্গত-মত, তাঁহার মতের নিকট পদদলিত। তিনি মেয়ে-পার্লেমেণ্টের গ্ল্যাড ষ্টোন, মেয়ে-আদালতের রমেশ মিত্র, মেয়ে-পুলীশের মনরো, এবং মেয়েলি-শাস্ত্রের মনু। সেই মহামেয়ে অষ্টাঙ্গ দুলাইয়া, গরব গমনে তালে তালে পা ফেলিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধাকে দেখিয়া কামিনীর মা সসম্ভ্রমে উঠিয়া, অতি মধুর ভাষায়, সম্মান-সূচক সম্ভাষণ করিয়া সযত্নে উপবেশনের আসন পাতিয়া দিলেন। বৃদ্ধা ঈষৎ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "তোমার বাড়ীতে আমি বসিতে আসি নাই,—কেবল দুটা কথা বলিয়া যাইব।" মাতা তটস্থ, ভীত, ব্যাকুলচিত্ত, যোড়হস্ত—"কেন কি হইয়াছে?" "কেন, কি হইয়াছে? জান না, সংসার মজাইতে বসিয়াছ, পরকাল নষ্ট করিতে বসিয়াছ, এর পর ভীটায় যে সন্ধ্যা পাবে না,—এত বড় আইবুড় ছেলে এখনও ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছ? যত দিন না ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আন, তত দিনত তোমার হাতের জল শুদ্ধ হইবে না!—তোদের দোষ নাই, দিন কাল বড়ই খারাপ পড়েছে,—এখনকার মা মাসী আপন আপন খোয়াজী লইয়াই ব্যস্ত,—আত্ম সুখে রত, খুটাবি কাল

পড়েছে, তোর দোষ কি? বাছার কেমন্ নবীন নধর গঠন! ঈষৎ গোঁফের রেখা! হতভাগী, কোন্ প্রাণে তুই বেটার বিয়ে না দিয়ে সংসারে আছিস্, ঘর কর্‌চিস্?" তখন কামিনীর মা অতি কাতর হইয়া, যোড় হস্তে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে উত্তর করিলেন—"আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাঁকে বলি, সে, হচ্চে-হবে বলে, বড় গ্রাহ্য করে না; ছেলের কাছে বিয়ের কথা পাড়্‌লে সেও কোন উত্তর দেয় না; কাণা-ঘুষা শুনি, কামিনী নাকি বেশী বয়স না হইলে বিবাহ কর্‌বে না, আমি একলা মেয়ে মানুষ, কেবল অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে মর্‌তেছি।" বৃদ্ধা উত্তর করিল "দূর পাগ্‌লি! আজও স্বামী বশ করিতে শিখ্‌লি না?—এর পর তোদের দশা হবে কি?—ছিছি! এক দিনের কথার চোটে শোয়ামীকে ত্রিভুবন দেখাইয়া দিতে পারিস্ না? আমি বলে চলি-লাম; আমাকে ও-পাড়ার বোসেদের বাড়ী যেতে হবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই তখন দুঃখ, রাগ, অভিমান যুগপৎ আসিয়া রমণীর হৃদয় অধিকার করিল। শ্রীরাধিকার নয়ন যুগল টল্ টল্, চল্ চল্, ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, মন্দাকিনী-বারিধারা নয়ন কোণ হইতে অল্পে অল্পে পড়িতে লাগিল। মানময়ী কোমলাঙ্গে অভিমান রূপ কঠিন বর্ম্ম পরিয়া জলময় চক্ষু রক্তজবা করত যেন যোদ্ধ্‌বেশধারিণী হইয়া খট্টাঙ্গে বসিলেন—যেন সিংহ-বাহিনী ভগবতী মহিষাসুর বধের মনস্থ করিলেন। এমন

সময়ে সেই চাকুরে-স্বামী শ্রীকৃষ্ণকিশোর—সেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের হলধর, সংসারতরীর গুণটানামাঝি, সেই কামিনীর মায়ের সুখ-মোক্ষ-দাতা—আজ্ঞাকারী, অবশ্যপোষ্য—চাকুরে পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকিশোর দিবসের কার্য্য অবসানে, গুটি গুটি গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অর্দ্ধাঙ্গীর রূপ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, আজিকার গতিক বড় ভাল নহে, আজিকার এইরূপ আধা-কোমল, আধা-কঠোর নহে—গঙ্গা যমুনার সঙ্গম নহে। এ মূর্ত্তি সৃষ্টিসংহারিণী—প্রলয়কারিণী—ডাকিলে উত্তর নাই, নিশ্চল, নিস্পন্দ, অসাড়। চক্ষু দিয়া থেকে থেকে টুপ্ টুপ্ ঝুর ঝুর কেবল মুক্তাফল বৃষ্টি হইতেছে?—তাহা যেন হেনিরি-রাইফলের গুলির ন্যায় কৃষ্ণকিশোরের বক্ষে বিঁধিতেছে, আর থাকিতে পারিলেন না, আর সহ্য হইল না,—তখন সকল দায়ের দায়ী, গরীব বেচারা কৃষ্ণকিশোর যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে অর্দ্ধাঙ্গীর মান ভঙ্গ করিলেন,—শেষ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে যাহাতে কামিনীর মত করিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারি, তাহার অবশ্যই চেষ্টা করিব।"

বিবাহ-রহস্য।

২য়—পড়িবার গৃহে।

কামিনী বাবু পিতার একমাত্র সন্তান,—নয়নের তারা, অঞ্চলের নিধি, সাত রাজার ধন একটী মাণিক। আদুরে আব্দারে ছেলে কামিনী যা বলে, তাই হয়; যা চায়, তাই পায়;—মা বাপ কামিনীর মনে কিছু ক্ষোভ রাখেন নাই। কামিনীর পড়িবার ঘরটী বেশ সাজান; বার্ণিস করা—সবুজ রঙের বনাত মোড়া একখানি দিব্য টেবিল, তার চারি ধারে চার খানি চেয়ার; টেবিলের উপর স্থূল সূক্ষ্ম লঘু গুরু হরেক রকম কাচনির্ম্মিত নানা বর্ণের জিনিস আছে; টেবিলের অগ্রভাগটাকে প্রথমদৃষ্টে অস্‌লার কোম্পানীর দোকানের মুখপাত বলে মনে হয়! "এতগুলি কাচদ্রব্য টেবিলে কেন?" জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনী বাবু মিহি সুরে সাধুভাষায় বলেন, "সমীরণ সাহায্যে কাগজপত্র উড়িয়া যাইবার ভয়ে ও-গুলি এখানে সর্ব্বদা সাবধানে সুরক্ষিত হয়।" টেবিলের পুরোভাগে একখানি প্রকাণ্ড দর্পণ—ছোকরা বাবু চেয়ারে বসিলে পায়ের নখ হইতে কেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের প্রায় সমুদায় অংশ এককালে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণপার্শ্বে মেহগনি কাঠের একটী লাল রঙের বাক্স; বাক্‌সে কি আছে, তাহা কে জানে? কিন্তু বাক্‌স তুলিলে, এরূপ একটা যোজন-ভেদী, অভ্রভেদী সুগন্ধ বাহির হয় যে, তাহাতে মনে

হয়, যেন পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশের যাবতীয় গন্ধদ্রব্যের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা-গন্ধরস সৃষ্ট হইয়া, ঐ বাক্সে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। টেবিলের উপরে সারি দেওয়া কেতাব-শ্রেণী; সকলগুলিরই প্রায় লাল রঙের মলাট; চসার, সেক্ষপীয়র, মিল্‌টন, ভল্‌টেয়ার রুসোঁ, বাইরণ সকলি আছেন;—দান্তে, কোমৎ, মিল, স্পেন্‌সার, বাইবেল, কোরাণ, ঋগ্বেদ, বিষ্ণুপুরাণ বর্ত্তমান। দেশী, বিলাতী নানা জাতীয় নভেল নাটকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। টেবিলের ঈশান কোণে, ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে, ওয়েবেষ্টার অভিধানের অন্তরালে ৺বটতলার সৃষ্টি "কি মজার শনিবার" "দাঁতে মিশি" "কমলে-ভ্রমর" "জীবন-তারা" "বিদ্যাসুন্দর" "মান-ভঞ্জন" "কলঙ্কভঞ্জন" "বস্ত্রহরণ" প্রভৃতি গ্রন্থাবলী অনল্প অবনতমুখে বিরাজিত। গৃহের দেওয়ালের চারি ভিত্তিতে সংলগ্ন নানা জাতীয় স্ত্রীলোকের নয় দশটী ছবি—সেগুলি গ্লাসকেসে ঢাকা।—কোথাও কোন লাবণ্যময়ী হ্যাস্যমুখী অনূঢ়া ইহুদি যুবতী একটী গোলাবের তোড়া লইয়া প্রিয়-জনের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। কোথাও বা বেশভূষায় সুসজ্জিতা, ধবলকান্তি, বক্রগ্রীব আড়নয়নবিশিষ্টা ইংরেজ-মহিলা ইংরেজপুরুষের সহিত হাতধরাধরি করিয়া খোসগল্প করিতে করিতে চলিয়াছেন! কোন পটে বিলাতী সাহেব-বিবির নাচ হইতেছে—মধ্যে মধ্যে কত রঙ্গরস বহিয়া যাইতেছে! যেখানে শ্রীযুত সচরাচর উপবেশন করেন, ঠিক্ তাহার সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে একটী অপূর্ণ যৌবনা বাঙ্গালী রমণী পালঙ্কের উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া ঈষৎ

হেলিয়া বসিয়া আছেন,—ওষ্ঠাধর লাল—যেন হিঙ্গুল মাখান, তাঁহার নবনীলনীরদতুল্য কেশদাম খাটের রেলিং হইতে বিলম্বিত হইয়া যেন ভূপৃষ্ঠ চুম্বনে উদ্যত; এই নবীনার পরিধান অতি মিহি কালাপেড়ে সাটী, দক্ষিণহস্তে একখানি পুস্তক—নয়নের নীচে সন্নিবিষ্ট। এ হেন প্রকোষ্ঠে শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কার্ত্তিক মাস উপস্থিত। পরীক্ষা নিকট। কামিনী বাবু ফের এবার বিএ, পরীক্ষা দিবেন। এইরূপ প্রচার ছিল, গতবারে শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন অঙ্কশাস্ত্রে কেবল সিকি নম্বর কম হওয়াতে কামিনী বাবু ফেল হয়েন। কিন্তু আর আর বিষয়ে খুব বেশী বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার পড়া শুনা ত সব সাবেক তৈয়ারি আছে, তাই কামিনী বাবু এবার অপরাপর বাঙ্গালা, ইংরাজী পুস্তক পাঠে অধিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। একান্ত একাগ্রতার সহিত চিত্তকে সংযম করিয়া, ভালে দৃঢ় সংকল্পের ত্রিবলীরেখা ধারণ করত, কামিনী বাবু "যৌবনে অপূর্ব্ব সম্মিলন" নামক নাটক পাঠ করিতেছেন,—দক্ষিণ পার্শ্বে নিধুর টপ্পা গ্রন্থখানি সমাদরে অবস্থিত। এমন সময় দূর হইতে চটীজুতা-বিশিষ্ট মনুষ্যের পদধ্বনি শ্রুত হইল। কামিনী কুমার অমনি আস্তে আস্তে সেই পুস্তকখানি, পুস্তক রাশির মধ্যে মিশাইয়া দিয়া, নিধু বাবুর গ্রন্থকে অঙ্কশাস্ত্রের নোট বুকে ঢাকিয়া ফেলিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিলের "Principles of Political Econo

গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রহস্ত কামিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ কার্য্য সমাধা করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখে এক প্রবীণ পুরুষ-মূর্ত্তি উপস্থিত হইল। পুরুষের নাম হরিহর দাস; গ্রাম সম্পর্কে কামিনীর খুড়ো! কামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের এখানে কি জন্য আগমন?" খুড়া বলিলেন, "বাছা তোমার সঙ্গে আজ আমার দুটা কথা আছে, আমার কথাটী রক্ষা করিতে হইবে।" কামিনী বলিলেন,—"আপনাকে আমি যথেষ্ট মান্য করি, কথা রক্ষা করিবার হইলে, অবশ্যই করিব।" খুড়া বলিতে লাগিলেন "দেখ তোমার মা বাপের তোমা বই আর কেহই নাই; তুমি অন্ধের নড়ি, তোমার বিবাহ দিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেই তাঁহাদের সুখ। তুমি যদি বিবাহ না কর, তাহা হইলে, তোমার মা বাপ সংসার ত্যাগ করিয়া বিবাগী হইয়া কাশীবাস করিবেন,—পিতা মাতাকে এরূপ কষ্ট দেওয়া ভাল কি? আমি বলিতেছি, আমার কথা রাখ,—এই অগ্রহায়ণ মাসে শুভলগ্নে তোমার শুভ বিবাহ—কার্য্য সম্পন্ন হউক।" এই কথা শুনিবামাত্র কামিনী বাবু চমকিয়া উঠিলেন—যেন হঠাৎ শত কামান তাঁহার সম্মুখে দাগা হইল—ভীত, স্তম্ভিত, বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ভাবে কর্ণযুগলে হস্ত দিয়া বলিলেন—"মহাশয়! অদ্য ভট্টারকবারে আমার সাক্ষাতে অমন কথা বলিবেন না, ও নিদারুণ বাক্য শুনিয়া আমার শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে।—আপনি কি মিল, স্পেনসার, ডারউইন, কোমৎ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থ পড়েন নাই?—

এ বাল্যকালে পাঠাভ্যাসের সময় ওসব কথা কি?—আমি এখন বিবাহ কি তাহা বুঝি নাই, পবিত্র-প্রণয় কাহাকে বলে তাহাও ভাল জানি না, বিবাহের পর দম্পতীর কর্ত্তব্য কি, সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহাও শিখি নাই। বিবাহবিষয়ে অনভিজ্ঞ এমন অবোধ শিশুকে কেন আপনারা হাতে পায়ে পাষাণ বেঁধে অগাধ জলে ভাসাইয়া দিবেন। বিশেষ আমি এখন বালক,—এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন হয় নাই; হাড় সকল এখনও নরম আছে; এমন সময় বিবাহ করিলে আমাদের নিজের ও দেশের অমঙ্গল আছে। যাহা হউক, আপনি একে খুড়ো, তায় বয়সে বড়, আপনাকে বেশী বলা সাজে না। এখন আমাকে মাপ করিবেন, ও পাপ কথা ছাড়া আমাকে যা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" খুড়া অবাক্, মুখে আর বাক্য সরে না, শরীর ঘামিতে আরম্ভ করিল; অতি ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"বাপু! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।" কামিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'ও সব পাশ্চাত্য মত—যে মত লইয়া ভারত উদ্ধার হইবে--আপনারা সেকেলে মানুষ, উহা ভাল বুঝিতে পারিবেন না;—সোজা কথায় বলি—"আমার এখন ১৮ বৎসর বঃয়ক্রম হইয়াছে, আর ১২ বৎসর অতীত হইলে, অর্থাৎ ৩০ বৎসর বয়সে বিবাহ করা উচিত। যদি জনক জননী একান্ত দুঃখিত হয়েন, তাহা হইলে আরও পাঁচ বৎসর কমে বিবাহ করিতে পারি। কিন্তু সে

কার্য্য করিতে হইলে এখন থেকে তার উদ্যোগ করা চাই। আমি স্বয়ং কন্যাকে দেখিব, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য রূপ গুণ ক্রমান্বয়ে এক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিব; ইহাতে যদি উভয়ের মনের মিল হয় এবং কন্যার পিতা যদি 'সদ্বংশজাত ও ধনবান্ হন— আমি-হেন জামাতাকে কন্যা-সম্প্রদান করিতে যদি তিনি উপযুক্ত পাত্র হন, তবে তখন সেই কন্যার, আমার সহিত একদিন বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারেন।” তখন খুড়া একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, “বাপু হে! তুমি বালক বলিয়া বুঝাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বালক হইয়া বৃদ্ধকে বুঝাইতে বসিয়াছ! বালক হইয়া তোমার যদি এত বুদ্ধি, তবে বিবাহের নামে আপনাকে বুদ্ধিশুদ্ধিহীন শিশু বল কেন?—আর যে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহা আমি কি,—স্বর্গ হইতে আমার প্রপিতামহ আসিলেও বুঝিতে সক্ষম হইবেন না।—তাই বলি বাপু, পিতা মাতার মনে আর কষ্ট দিও না,—ভীটায় সন্ধ্যা দিবার যোগাড় কর।” কামিনীকুমারও কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“আপনারা যদি আমার কথা না বুঝিতে পারেন, তাহাতে আমার অপরাধ নাই,— আপনাদের সুশিক্ষার অভাবই না বুঝিবার কারণ। আমার মতে—আমার প্রণালীর অনুযায়ী আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত 'আছি, অপরের মতে বিবাহ হইতে পারে না, বিবাহ বড় শক্ত বিষয়।” খুড়া তখন আস্তে আস্তে 'বলিলেন—“তাই বল, তোমার কিরূপ বিবাহের

প্রণালী, তোমার পিতাকে সেই কথাই বলিব।” কামিনী বলিলেন “সে কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে?” খুড়া—“আমি বাপু ওসব কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই।” কামিনী বলিলেন—“আচ্ছা তবে কল্য আপনাকে লিখিয়া জানাইব।” তখন গ্রাম্য-খুল্লতাত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। বিধাতা, তিন বিন্দু সুধা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফেলিয়াছিলেন—১ বিন্দু, ইলিস মাছের ডিমে; ১ বিন্দু, পাকা আমে, আর এক বিন্দু ঘটকের মুখে। কামিনী আজ সেই খুড়ারূপী ঘটকের অমৃত-বিনিন্দিত বাক্যে বড় পুলকিত হইলেন—যেন সুধাপানে বিহ্বল হইলেন; খুড়া উঠিয়া গেলে, মিহিসুরে এই গানটি ধরিলেন,—

ওহে যোগীরাজ! কোথা হে বিরাজ!
রমণীসমাজ, আসা কি আশায়।

বিবাহ-রহস্য।

৩য়—পলায়ন।

এত দিন বি, এ, পরীক্ষার হাঙ্গামে কামিনী বাবু বিবাহের পাপ কথা মুখে আনেন নাই, কাহাকেও আনিতে দেন নাই। জনসমাজে প্রচার ছিল, তিনি সেই সুসজ্জিত সুরম্য গৃহে খিল দিয়া, সমস্ত দিন বিদ্যা চর্চ্চায় রত থাকিতেন। কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে বৈকালে—৪টা না বাজিতেই, বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব

করিয়া সেই ঈষৎ বাঁকা হেলান-নয়নে, সেই গন্ধদ্রব্য-পূর্ণ সুরঞ্জিত কেশে, কামিনী বাবু, ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সে সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব বাহার দেখিলে মনে হইত, যেন ইন্দ্রদেব, প্রফুল্লমন্দার-পুষ্পময় নন্দনকাননটীকে সঙ্গে লইয়া শচী-সম্ভাষণে যাত্রা করিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যহ স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়া, বাবুজী প্রায় রাত্রি দশটার পর, গৃহাভিমুখে আসিতেন; আবার সেইরূপ নিজকক্ষে অর্গল বদ্ধ করিয়া নিঝুম ভাবে সরস্বতীর উপাসনা করিতেন।

এক্ষণে ত পরীক্ষা শেষ হইল। অবোধ পিতামাতা পুনরায় পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কামিনী বাবু জানাইলেন, উপযুক্ত মনোমত পাত্রী, শ্বশুর ও সম্বন্ধী পাইলে, তিনি বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক নহেন। কামিনী বাবু বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্তত লোকে যাহা বলে,—তাহা আমরা প্রকাশ করিলাম, যথা;—"পাত্রটীর ধমনীতে নিয়তই যে আর্য্য-শোণিত বহিতেছে, ইহার বিশেষ প্রমাণ থাকা চাহি। মাতৃকুলে ডেপুটীপদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং পাসারওয়ালা উকীল, সমুদায়ে তিন চারি জন থাকা আবশ্যক। পিতৃকুলে,—পিতা, নিসন্তান হইবে,—এবং নিদানপক্ষে তাঁহার পঁচিশ হাজার টাকা জমীদারীতে আয় থাকিবে। কন্যার রঙ—তুষারনিভ শ্বেতবর্ণও নহে, নবোদিত বাল-সূর্য্যের ন্যায় লালবর্ণও নহে, অথবা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত বসোরা-দেশ-সম্ভূত গোলাপপুষ্পের বর্ণও নহে,—খাঁটি দুধে-আল্‌তা মিশাইলে যাহা হয়, তাহাও নহে। এ রঙ কেমন এক

প্রকার বর্ণনাতীত হইবে! তার পর শ্বশুর সাড়ে বার হাজার টাকার গহনা দিবেন, বিবাহের পর দিন হইতে বরকে পকেট খরচের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা দিবেন। কন্যার সঙ্গে দুইটী দাসী আসিবে, তাহার খোরাকী ও মাহিনা শ্বশুর দিবেন। এবং মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে শ্বশুর তাঁহার সমস্ত বিষয় কামিনীর নামে উইল করিয়া যাই-বেন। এই সকল স্থির হইলে, দেখিতে হইবে, কন্যাটী পবিত্র প্রেম বুঝে কি না, বিবাহের পর দিন হইতে কামিনী বাবুর সহিত ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে কি না, এবং আচার ব্যবহার হাবভাব ইংরেজী-মতে কি না? এই সকল সম্পূর্ণরূপে ঠিক হইলে, অবশেষে কন্যাটীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে পজিটিভিষ্ট হওয়া চাই।" কামিনী বাবুর বিবাহের ফর্দ্দ শুনিয়া মা বাপ হতবুদ্ধি হইলেন, প্রতিবেশী মণ্ডল অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন, চাক্‌রাণী-কুল পরস্পর আঁখি-ঠারাঠারি করিয়া মুচ্‌কে হাসি হাসিল।

বিধু বাবু কামিনীর সহপাঠী; বড় স্পষ্টবক্তা লোক,—পাড়ায় তাঁহার পসার অধিক। কামিনীর পিতা বিধুকে অনুরোধ করিলেন,—"দেখ বাপু, কামিনীর মনের কথা কি, তাহা তুমি না হইলে কেহ বুঝিতে পারিবে না;—একবার তুমি তাহাকে বুঝাইয়া বল। বিধু বাবু অমনি কামিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত; বলিলেন,—"কি হে কামিনী, আজকাল কেমন আছ?—তোমার নাকি বিবাহ হবে? বেশ বেশ! এ বয়সে অর্দ্ধাঙ্গী না হলে সাজে কি?—শুনিতেছি, তোমার ক'নে পছন্দ হইতেছে না;

বল দেখি ভাই! তুমি কিরূপ স্ত্রী চাও?" কামিনী বাবু যেন হঠাৎ বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"ছি! তুমি সর্ব্বদা স্ত্রীলোকের কথা কও কেন?—আমি ও সব কথা ভাল বাসি না; নারীজাতি পরম পবিত্র; তাঁহাদের কথা লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিতে নাই, ওরূপ কথায় তাঁহাদের অঙ্গে কালিমা স্পর্শ করিতে পারে, অপর কথা কও।" বিধু বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তত্ত্ব কথা পরে হবে;—ডারউইনের থিয়রি—Survival of the fittest এ সব কথা শেষে হবে; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই ত আমরা চিরকালটা এক সঙ্গে পড়িতাম, সেই আজীবন নোট মুখস্ত করে, গলা ভেঙ্গে গিয়াছে;—তবে আমার অপরাধের মধ্যে আমি গত বৎসর বি, এ, পাস হই, তুমি ফেল হও!—জিজ্ঞাসা করি, তুমি ইহার মধ্যে এত নীতিজ্ঞ হইলে কিরূপে? স্ত্রীলোকের নামে অমন চমকে উঠ কেন? এদিকে বিবাহের নামে ত কম্পিত-কলেবর দুর্ব্বাসা, ওদিকে ফর্দ্দ দিবার সময় যেন পাকা মুচ্ছুদ্দি। আমরা ভাই মোটা বুদ্ধি লোক; বড় কিছু বুঝি না, তুমি ইহারই মধ্যে পবিত্র প্রণয় বুঝেছ। তুমি যেরূপ কন্যার ফরমাইস্ করেছ, তাহা বেদে নাই, কোরাণে নাই, বাইবেলে নাই, এত শিখিলে কোথায়? আমাকে আজ সব বুঝাইতে হইবে।"

কামিনী বাবু দেখিলেন, আজ শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছেন,—নিস্তার নাই। ক্রমে একটু নরম হইয়া বলিলেন—"তোমার ভাই চিরকালটা, এক রকমেই গেল,

কেবল সেই ঠাট্টা, আর তামাসা নিয়েই আছ।" বিধু বাবু উত্তর করিলেন, "তামাসা নয়, সত্য সত্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, পবিত্র প্রণয়ের অর্থ কি? আমরা বি, এ, পাস হয়েছি বটে, কিন্তু তোমার পড়াশুনা অনেক;—আমার অপেক্ষা তোমার জ্ঞানের প্রসর অধিক; কামিনী বাবু ধীরে গম্ভীরে উত্তর করিলেন "পবিত্র প্রণয় বর্ণনাতীত, তাহা কেবল হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়, দেহের সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই, কেবল মনের সঙ্গে তাহার দেখাশুনা; সেই অনির্ব্বচনীয় প্রণয় না জন্মিলে, বিবাহ করিতে নাই—সে প্রণয়রস বিনা সংসার বৃথা, শরীর বৃথা, প্রাণ বৃথা!" বিধু বাবু বলিলেন,—"সেই অনির্ব্বচনীয় জিনিসটা কি একবার শুনিতে পাই না?"

তখন কামিনী বাবুর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠিল। কল্পনা দেবীর আবির্ভাবে আর পার্থিব গদ্যে কথা কহিতে পারিলেন না,—অবিরল অবিশ্রান্ত কবিতামালা স্বতঃ মুখ-নিঃসৃত হইতে লাগিল;—

হায় সখে! কেমনে বর্ণিব তাহা—
যাহা জাগরণে স্বপ্ন, স্বপ্নে জাগরণ,
যাহা ধরাধামে স্বর্গ, নরকে বৈকুণ্ঠ,
হৃদ্‌পথে যে ভাব উদিলে, হৃদি কাঁপে
গুরু গুরু,—যথা যবে প্রভাত-কমলে
শিশিরের বিন্দু, কাঁপে প্রভঞ্জন-বলে।
কেমনে বর্ণিব—দীন আমি—কোথা পাব
রত্নরাজি—সে ভাবময়ী, সে মধুময়ী

নারীমূর্ত্তি—জেগে উঠে মৃত দেহ যার
দরশনে,—হায় যথা উঠেছিল জেগে
কপিবৃন্দ শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি, ত্রেতায়—

বিধু হাসিয়া বলিলেন—"আর না, থাম ভাই! আমি বুঝিয়াছি। এখন কথা হইতেছে, ও-সব বাজে কথা—ভণ্ডামি রাখ—সংসারে যা রয় বসে, তাই কর, পাগলের মত পবিত্র প্রণয় ভেবে মিছে দিন কাটিও না, গৃহকার্য্যে মন দাও—টেড়িকেটে, পোষাক এঁটে বেড়ালে ত দিন যায় না। মা বাপকে আর মনোব্যথা দিও না। আর শুধু পবিত্র প্রণয় কে?—১২ হাজার টাকার গহনা চাহি—জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রী ৫ হাজার টাকার মতির মালা গলায় না দিলে কি পবিত্র প্রণয় জন্মে না? লেখা পড়া শিখেছ,—বক্তৃতা দাও, গহনাপ্রথা, পণপ্রথা ভাল নয় বল—এখন কি? একটী ভাল কন্যা স্থির হয়েছে। কন্যাটী রূপে বল, গুণে বল, বংশে বল, তোমার অপেক্ষা ঢের ভাল।" কামিনী বলিলেন—"শুধু রূপ, গুণ, বংশ লইয়া কি করিব?" বিধু উত্তর করিল—"ধূনা দিতে হবে।" কামিনী—"তোমার কেবল তামাসা, বলি কত দূর ইংরেজি পড়েছে? বিধু—"হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সোসিওলজী মুখস্ত করিয়াছে—হবেত? ইংরাজীতে আউট না হলে কি বিবাহ করা হয় না? ১০।১১ বৎসরের মেয়ে তোমার জন্য কত ইংরেজী পড়িবে বল? কন্যাটী বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংরেজীও একটু একটু শিখিতেছে।"

কামিনী দুঃখিত হইয়া উত্তর করিলেন—"মাপ কর ভাই!—আমার বিবাহে কার্য নাই;—পিতাকে বলিও

তিনি যেন পুত্রের কোন আশা ভরসা না করেন,—আমি চলিলাম; আমি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ফিরিব।” বিধু বলিলেন—“তুমি কুপুত্র।” বিধুর মুখে কামিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া পিতার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৃহে হাহারব উঠিল—মাতা মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই দিন হইতে কামিনীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না—দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করে, বিবাগী হইবার সময় কামিনীর পকেটে ছাঁকাটপ্পার একখানা খাতা ছিল, কেহ কেহ বলে, সেটা গানের খাতা নহে, দাসুরায়ের ছেঁড়া পাঁচালি,—কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন,—পাঁচালি ও খাতা দুইই ছিল।

কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ।

দিনের পর দিন যাইতেছে, কালচক্র চোখের উপর বুকের মাঝে অনবরত ঘুরিতেছে,—বল দেখি ভাই! কি গতিতে তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন অতিবাহিত হইতেছে? এ দাস-জীবনের বদ্ধ-স্রোত, এ মহাশ্মশানের দগ্ধমরু দিয়া চির-দিনই কি অমনি একইভাবে ধীকি ধীকি বহিবে?—কখনই কি আর সে বেগ, সে তরঙ্গ-বিক্রম, সে স্ফূর্ত্তি দেখা দিবে না?—গিরিকন্দরবিদীর্ণকারিণী স্রোতস্বতী আর কি কখন দুরন্ত ঐরাবত ভাসাইতে সক্ষম হইবে না? তোমরা যা বল, যা ভাব, ভাই! আমি কিন্তু চারিদিকেই ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন নিবিড় অনন্ত অন্ধকার দেখিতেছি—নির্জীব, ক্ষীণ, মুমূর্ষ প্রায় দেহ

ধূলায় লুটাইতেছে,—জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, উত্থানশক্তি নাই—শৃগালকুক্কুর সদাই পদাঘাত করিতেছে: এ নিস্পন্দ, নিশ্চল, অসাড় জীবনের উদ্দেশ্য নাই, আশা নাই,—এ শ্মশানে কেবল একমাত্র শবরাশির হাট!

আর সহ্য হইল না। স্বদেশহিতৈষী যুবক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কক্ষ হেলাইয়া, বক্ষ দুলাইয়া, হস্ত নাড়িয়া, মুখ বিকৃত করিয়া, সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সে গগনভেদী বিকট রাক্ষসী-সুর, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল—গোরু, মানুষ অস্থির হইয়া পড়িল, আসন্ন-প্রসবা রমণী ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন, ডাক ছাড়িতে লাগিল। সেই গারিবল্ডীর অবতার, ওয়াশিংটনের প্রপৌত্র, কসথের মাসতুত ভাই, আরাবী পাশার সম্বন্ধী—তখন ম্লেচ্ছভাষায় চীৎকার করিতে লাগিলেন—"কোন্ মূর্খ বলে, ভারত নির্জীব?—আমি যে বক্তৃতা দিয়া—দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী বক্তৃতা দিয়া, ভারতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছি! ঐ দেখ, রাস্তা দিয়া কত লোক বেগে চলিয়া যাইতেছে। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় এবার যে ৩২ শত ছাত্র উপস্থিত হইল, সে আমারই বক্তৃতাবলে; এই যে ৯ আইন উঠিয়া গেল, সে আমারই বক্তৃতাবলে; এই যে রমেশ মিত্র হাইকোর্টের চীফ্‌জষ্টিস হইলেন, সে আমারই বক্তৃতাবলে; অধিক আর কি বলিব, এই যে আত্মশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, তাহাও আমারই বক্তৃতার বলে।—বক্তৃতা, বক্তৃতা, বক্তৃতা,—অচিরে ভারত উদ্ধার হইবে! ভারতবাসি! ভয় নাই, আমি

আছি; বক্তৃতা দিয়া তোমাদের সকল অভাব মোচন করিব;—বক্তৃতায় তোমাদের শত শত সহস্র সহস্র কলের জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিবে; বক্তৃতায় দেশাভ্যন্তরে কলের তাঁত প্রস্তুত হইবে; বক্তৃতায় বঙ্গের কৃষককুল কলের লাঙ্গল পাইবে; বক্তৃতায় ইহকালে ইন্দ্রপদ, পরকালে মোক্ষপদ, লাভ হইবে। হা ভারতবর্ষ! তোমার সন্তানগণ বুঝে না যে, তুমি কি পদার্থ! আমি একলা মানুষ—কদিক্ দেখিব? আমাকে একটী দোসর দাও, তখন আমি আরও, তোমাকে আরও উর্দ্ধে তুলিতে পারিব। হা ভারতবাসি! হা প্রাণের ভাই! হা অভেদ-আত্মা! এস ভাই! একবার কাছে দাঁড়াও। তোমরাই আমার সম্বল, তোমরাই আমার সহায়, তোমরাই আমার সম্পত্তি। আমি তোমাদের জন্য দিবানিশি চক্ষের জল ফেলিতেছি,—তোমাদের জন্য আমার উদরে অন্ন রুচে না, রাত্রে ঘুম হয় না; তোমাদের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই আমি এরূপ জীর্ণ শীর্ণকায়! অদ্য আর না—বিদায়!”

আমি ভাবিলাম, লোকটা কে?—বিশেষ তথ্য জানিতে হইবে; পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টা হইল। বাবু তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন; আমি বাহিরের বারান্দায় প্রচ্ছন্নভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটী বালক আসিয়া মৃদুস্বরে বাবুকে বলিল, “দাদা স্কুলের মাহিনা দিন।” দেশহিতৈষী দাদা বলিলেন “আমার হাতে টাকা নাই, কিছুকাল অপেক্ষা কর।” ছোট ভাইটী বলিলেন,—“দাদা, কাল মাহিনা না দিলে নাম

কাটিয়া দিবে,—আপনিত বলেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই দিবেন।" বালকের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল দাদা তখন চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন——দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিলেন,-"তোমার যে স্কুলের মাহিনা দিব স্বীকার করিয়াছি, তাহার কিছু রেজষ্টরী লেখাপড়া আছে বলিতে পার?—এই বক্তৃতা করিয়া আসিলাম, এখন বিরক্ত করিও না; এখন এখান হইতে চলিয়া যাও। তুমি আমার পিতার পুত্র না হইলে, এখনি উপযুক্ত শাস্তি দিতাম।" বালক তখন অধোমুখে সজলনেত্রে প্রস্থান করিল।

মলিনবস্ত্রপরিধানা, পরিপাণ্ডুমুখকান্তি, বৃদ্ধা জননী গুটি গুটি আসিয়া উপস্থিত—দেশহিতৈষী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাছা গোপাল, আজ সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তাই এত রাত্রে এখানে এলাম। কাল একাদশী, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, বাছা তুই আমার পেটের ছেলে, তোকে না বলেই বা বলি কাকে, আমার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই—বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমাকে আজ কিছু পয়সা দে।" স্বদেশানুরাগী যুবক উত্তর করিলেন,—"তোমার পয়সা পয়সা বুলি আর ঘুচিল না—এত রাত্রে আমি তোমার জন্য পয়সা বার করে বসে আছি কি না, দে বলিলেই অমনি পয়সা পাইবে। আর তোমার কাছে যে পয়সা নাই, তাহা আমি এক দিনের জন্যও বিশ্বাস করিতে পারি না; বাবা যত টাকা রোজগার করিতেন, সবই তোমার হাতেই দিয়াছিলেন, সে সব টাকা কোথায়

গেল? কেবল, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তোমার অপর ছেলে দিগকে সেই টাকা গুলি দিবে মনে করিয়াছে! তাহা পারিবে না, আদালত খোলা আছে। তোমাকে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বালা করিতেছে;—তোমার সকলি ভণ্ডামি;—তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি দিব্য করিয়া আহার করিয়াছ; আমরা বহুদর্শী লোক, রাজনীতি বুঝি, আমাদের নিকট ফাঁকি দিবার যো নাই। মিছা গোল করিও না, কাযের ক্ষতি হয়।" জননী বলিলেন—"বাছা, আমি মিছা কথা কহি নাই—বাছা! তোর দিব্য করে বলছি, আজ আমার খাওয়া হয় নাই। কোথা কি পাব? তুমি ও মাসে তিনটী টাকা দিয়েছিলে, তাতেই সে মাসটী বেশ চলেছিল। গোপাল! এ বুড়ো মাকে আর কষ্ট দিস্ না।" জননীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

স্বদেশানুরাগী পুত্র বলিলেন—"এখন কাঁদ্‌লে কি হবে?—ও মায়াকান্না ঢের দেখিছি। একটুতে চোখ্‌ দিয়ে জল পড়ে,—যেন থিয়েটরের অভিনেত্রী। তোমার কাছে যদি কিছুই না থাকে, আমার বিশ্বাস, তবুও অন্ততঃ এখনও দশ হাজার টাকা মজুদ আছে।"

মাতা বলিতে লাগিলেন,—"গোপাল তোকে আর কি বুঝাব?—আমার অদৃষ্ট মন্দ,—পূর্ব্বজন্মে কোন পুত্রবতী মাতাকে কষ্ট দিয়া থাকিব, তাই এ জন্মে তার ফলভোগ করিতেছি। বাছা! আমার হাতে টাকা কি করে থাকবে? তোর বাপ যখন স্বর্গে যায়, তখন তোরা সব শিশু,—

সেই অবধি বিশ বৎসর কাল, একটী পয়সা কেহ রোজগার করিয়া দেয় নাই; সেই টাকা থেকে আমি তোদের ভরণপোষণ করেছি—লোক-লৌকতা রেখেছি,—স্কুলের মাহিনা দিয়াছি, ঘরে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইয়াছি। গোপাল! বোধ হয়, তোর মনে আছে, শেষে বাড়ী বাঁধা পড়ে—বাছা! আমি কার জন্য টাকা লুকায়ে রাখিব বল?—তোরাই ত আমার সর্ব্বস্ব, জীবনের জীবন। বাছা আমার অঙ্গে তিন হাজার টাকার গহনা ছিল, একে একে সবই বাঁধা পড়ে। শেষ কেবল তোমার পিতৃদত্ত একটী অঙ্গুরী ছিল—তাহাতে তোমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল,—সর্ব্বস্ব হারাইয়া সেটী আমি রাখিয়াছিলাম, কিন্তু বাছা সেটীও আর নাই"—

জননীর কণ্ঠরোধ হইল।

বাবু বলিলেন "Halo! How have you lost that! আমি পিতার জীবনচরিত লিখিব মনে করিয়াছি, তাঁহার চেহারা পাইলে পুস্তকে একটী প্রতিমূর্ত্তি দিবার ইচ্ছা ছিল।—তুমি বড় ডোক্‌লা, ছি! ছি! কি রকমে তাহা নষ্ট করিলে?"

জননী বলিলেন—"গোপাল! তোমার জন্য তাহা হারাইয়াছি। তখন আমাদের বড় কষ্ট—তোমার পরীক্ষা দিবার জন্য ২০৲ টাকা চাই;—তুমি ছল ছল নয়নে আসিয়া বলিলে,—"মা কি হবে—আমি তোমার মুখ দেখিয়া বলিলাম, বাছা ভাবিস না।—আমি সেই অঙ্গুরী বেচিয়া তোমায় ২০৲ টাকা দিলাম,—বাছা তোমারাই

আমার সব—এ সংসারে আমার আর কে আছে?" বুদ্ধিমান পুত্র বলিলেন—"তোমার কথায় আমার বিশ্বাস নাই। জননী বলিলেন—"গোপাল! বিশ্বাস করিয়া কায নাই,—আমি তোমার বৃদ্ধ মা, আমি দুটী পয়সা ভিক্ষা করিতেছি,—এ রাত্রে আমি কোথায় পয়সা পাব,—আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" স্বদেশহিতৈষী পুত্রের তখনও ক্ষমা নাই, বলিলেন—"তুমি বিরক্ত করিও না,—তোমার জ্বালায় অস্থির হইয়াছি;—খুজরা পয়সা দিব না, হিসাব-গোল হইবে, আমি কাল বৈকালে তোমাকে এ মাসের দরুণ ৩৲ টাকা দিব—শীঘ্র এখানে হইতে চলিয়া যাও।—Local Self-Government এর Scheme আজই draft করিতে হইবে।"

জননী উর্দ্ধমুখে যোড়হস্তে সজলচক্ষে ভগবানকে ডাকিলেন, "ভগবান! আর আমায় যন্ত্রণা দিও না—যম! আমায় গ্রহণ কর"—মনে মনে বলিলেন—চক্ষের জল ফেলিব না, বাছার অমঙ্গল হইবে, এই বলিয়া জননী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল। আমি কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বাবুজী বাক্স হইতে নূতন জড়াও স্নুবর্ণ চুড়ি বাহির করিয়া লইলেন,—এবং দ্রুতপদে অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিলাম, ইহাঁরাই কি আমাদের স্বদেশহিতৈষী? ইহাঁরাই কি আমাদের দেশের গারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিনি?—যেমন দেশ, তেমনি তার গারিবল্ডী।

স্বদেশানুরাগ বড় শক্ত পদার্থ। সহজে দেশের প্রতি মমতা জন্মে না,—শিক্ষা চাই, সচরাচর একপুরুষে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা জন্মে না। দুঃখ এই আমাদের দেশে অনেক বিড়াল তপস্বী হইয়াছেন,—আগাছা জন্মিয়া জঙ্গলময় দেশকে আরও জঙ্গলময় করিতেছেন। স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে হয়, হৃদয়ের শোণিত দিতে হয়, স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। আমাদের দেশের স্বদেশানুরাগী পুরুষের আত্মত্যাগ দূরে যাউক,—দুই পয়সার জন্য কাতর। ম্যাট্‌সিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, সংসারসুখ ছাড়িয়া, অর্থলোভ দমন করিয়া কতকাল অন্নকষ্টে থাকিয়া স্বদেশের কার্য্যে ঘুরিয়াছিলেন। তেমনটী এখানে কে আছেন? আমাদের দেশের লোকের কার্য্য দেখিয়া ধিক্কার জন্মিয়াছে। সকলি কাল্পনিক, সকলি মৌখিক। তাই বলিতে হয়, দেশ অন্ধকারময়; বাঙ্গালী যে জড় পদার্থ, সেই জড় পদার্থই আছে,—যেরূপ নির্জ্জীব ক্ষীণবল ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। শক্তি বৃদ্ধি হয় নাই,—চলিতে শিখে নাই, হামাগুড়ি দিয়া সেইরূপই চলিতেছে,—চক্ষু ফুটে নাই—পরের চোখে সেইরূপই আবছাওয়া দেখিতেছে;—লাভের মধ্যে এখন আমরা ভণ্ডতপস্বীর প্রতাপে মারা যাইতেছি। ইহার প্রতিকার না হইলে আমাদিগের আর মঙ্গল নাই।

ভারত মাতার শ্রাদ্ধ।

প্রথম সর্গ

কাঁদে গয়ারাম, গুরু গভীর গর্জ্জনে,—
"Awake, O! mother, arise, awake,
কথা ক মা, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—গয়ারাম;
তোর তরে খেটে খেটে গায়ে নাই রক্ত;
ব'কে ব'কে ভেঙ্গে গেছে গলা; লিখে লিখে নিব
কত ভোতা—জে' মার্কা; কি আর অধিক ক'ব,
কোমরে ধরেছে ফিক্—গাঁটে গেঁটে-বাত
—ভ্রমি কত রেলপথে দেশ দেশান্তরে।
আবার ডাগর ডাকে ডাকি গো জননী,
Awake, O! mother, arise awake"
তথাপি ভারতমাতা নাহি দিল সাড়া;
স্তিমিত নয়নযুগ্ম মলিন বদন,
বিশুষ্ক অধর-প্রান্ত, নিশ্চল শরীর,
এলো থেলো কেশরাশি—আছেন পড়িয়া।
তখন ফুকারি কেঁদে উঠে গয়ারাম,
মা মোলো মা মোলো বুঝি হল সর্ব্বনাশ!
কোথা হে মিষ্টার যদু, মিস্ ক্ষুদিরাম,
মিসেস্ পাঁচী বা কোথা—এস অসময়ে;
এ সাধের মায়ে বুঝি নারিনু বাঁচাতে।
মাতার সঙ্কট শুনি, এলো ধাওয়াধাই,
ভজহরি, পাঁচকড়ি, ক্ষুদিরাম, যদু—
বাম করে স্ত্রীলোকের ধাত দেখে ক্ষুদি,—

যদু চোঙ বসাইল জননীর বুকে,
পাঁচু ব্রাণ্ডি ঢেলে দিল জননীর মুখে
—মিশাইয়া জুস্ তাহে বাচ্ছা মোরগের ;—
ভজহরি ক্ষুরে করি মুড়াইল মাথা ;
গয়ারাম উচ্চরবে ডাকিল আবার
mother ! Awake O arise awake
তথাপি নিঠুর মাতা না দিলা উত্তর।
তখন বুঝিল সবে নিশ্চয় মরণ।
ধরাধরি করি মায়ে করিল বাহির।
বিলপিল ভক্তবৃন্দ করি হায় হায়।
হরি হরি বলো সবে সর্গ হলো সায়॥

দ্বিতীয় সর্গ।

কৃষ্ণ অঙ্গে কালো-কোট পরে গয়ারাম ;
কালো কোটে বসাইল কালো-রং ফিতা—
ত্রিকালোয় গয়ারাম সাজিল অদ্ভুত—
ভূষো-মাখা ভোম্রা যেন ঢাকা দিল মেঘে।
একে একে, দুয়ে দুয়ে সন্তান সকল
অশৌচ গ্রহণ করে মায়ের লাগিয়া।
তখন বিরলে বসি ভাবিল যুকতি,—
"কিরূপে হইবে শ্রাদ্ধ, কিরূপে সদ্গতি,"
উত্তরিল ভজহরি করি যোড় কর,—
"শুন মন দিয়া এ যে বিষম ব্যাপার—
পুড়াবে কি মাতৃ-অঙ্গ জাহ্নবীর কূলে ?'

ছি ছি ছি, ছি ছি! ছি ধ্বনি করে পয়ারাম ;—
"কি কহিলি, রে বর্ব্বর ! বাঙ্গালী-কুলের কালী
ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগ—
আলোকিত দেশ যত সভ্যতা আলোকে,—
অসভ্যতা- পথ্য এবে, দাহি দেহ ! শুধু
দাহ নহে—গঙ্গা উপকূলে— ! Prejudice !
Thy name is Traitor ! ! শুনিবে যখন ;
ইংলণ্ডবাসী এ কথা : কাটি করি কালী
দিবে মুখে ;—হাসালি জগৎ,—উপযুক্ত
শিষ্য তুই না পারিলি হ'তে ভাগ্যদোষে।
ছল ছল চোখে পুন বলে ভজহরি,
"না বুঝিয়া গুরুদেব কেন দাও গালি ?
এই কি বিশ্বাস তব,—আমিই বলিব
দাহিবারে দেহ ?—সভ্যভূমি-সম্মানিত
নহে যাহা ?—য়ুনানী-মণ্ডলে যাহা নহে
প্রচলিত ?—গোর দিব মাকে, সার কথা
এই।" ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ধ্বনি উঠিল সভায়
ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ বলি দিল করতালি।
"কোথা দিবে মাতৃগোর ?" হাঁকে পয়ারাম।
"ওয়েষ্টমিনিষ্টার-আবি নামে কাছে পুণ্যভূমি,
বিলাতের এক প্রান্তে,—সতীসাধ্বী রাণী
এলিজেবেথের পাশে, গোরিব মায়েরে ;
অথবা ফরাসী-ভূমে, শ্রীমতী রোলন্দ
আছেন শয়ান যথা—পতিপরায়ণা

গুণবতী সতী। আনন্দলহরী-লীলা
খেলিল সভায় ; উঠিল সুখের ঝড়,
মড়্মড়ি কাঁপিল গেহ ;—ফুরাইল সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

মায়ের ছরাদ হবে—দিন স্থির হয় কবে
ভক্তগণ ভাবিয়া আকুল।
খৃষ্টের জনমক্ষণ, স্থির করে ভক্তগণ,
সেই দিনে সব সুপ্রতুল॥
কিবা শ্রাদ্ধ-আয়োজন, কিবা তার উপকরণ
কার হাতে দিব যজ্ঞভার।
কোথা হতে টাকা পাই, উপায় চিন্তহ ভাই,
অসময়ে ভাব নাম তাঁর॥
শ্রাদ্ধ হবে টৌনহলে পৌরহিত্য জনবুলে
মনখুলে করিনু অর্পণ।
উৎসর্গ হইবে বৃষ,——মায়ের সপ্ত পুরুষ
স্বর্গধামে করিবে গমন॥
টাকা চাই টাকা চাই, কোথা গেলে টাকা পাই,
কেমনে পুরিবে মনস্কাম।
গয়ারাম বলে ছি! টাকার ভাবনা কি,
টাকা তোলা কত বড় কাম॥
চাঁদর বাঁধহ খাতা, রুল টান পাতা পাতা,
নাম রাখ শ্রাদ্ধ-ফণ্ড বলি।
দেশে দেশে সবে ফির, সহি লও বাড়ী বাড়ী,
জয়াতুরি কাঁধে লও ঝুলি॥

কলিকালে হদ্দমুদ্দ, মায়ের হইবে শ্রাদ্ধ,
আদ্যক্রিয়া ভারত ভিতর।
পিণ্ডি দিবে গয়ারাম. পূর্ণ হবে মনস্কাম,
করতলে ধর্ম্ম-অর্থ—বর॥
চাঁদার খাতা বগলে, চলেছে মা-মরা-ছেলে,
মুখে উড়ে চুরটের ধূম।
"ভিক্ষা দাও গো প্রতিবাসি, মা মরেছে দেখ আসি,
শ্রাদ্ধ হবে মহা ঘটা ধূম॥"
দ্বিজ কবিরত্ন ভণে, ঝুলি পূরি দাও ধনে,
জননীর হইবে উদ্ধার।
বাসি মড়া ঘরে পচে, টাকা দিলে মান বাঁচে,
সর্গশেষ হৈল এইবার॥

চতুর্থ সর্গ।

তেজঃপুঞ্জ যোগী এক, গৌরাঙ্গ বরণ,
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে চক্ষু, ভালে শশিকলা,—
কহিতে লাগিল ধীরে, সুগম্ভীর স্বরে—
"কেন বাপু, ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রম অকারণ?
কে কহিল,—মরেছেন, ভারত-জননী?
অনন্ত অক্ষয় মাতা মরিবার নয়!"
উত্তরিল গয়ারাম হাসি হাসি মুখে,—
কি বলিলে? মরে নাই মা? ভণ্ড যতি
তুই!—ডেকেছি ইংরেজী ছন্দে শতবার
মাকে,—সাড়া নাহি দিল তবু মাতা। ক্ষুদ্ৰ

বলে, ফরাসী ভাষায় ডাকিয়াছি আমি,
বলে ভজহরি, জননীরে জর্ম্মাণেতে
সম্বোধিছি কত, তবু নিরুত্তর হায়!
যথা যবে পোড়া শোল মাছে, দিয়া নুন
কচুটিলে আর নাহি রঙ্গে ভঙ্গে নড়ে;
—যদিও পুকুরে তাহা ফেলাইয়া দাও।
কহিতেন যোগীবর, "ভ্রান্ত বড় তোরা।
ডাক্ দেখি রসনায় সেই সুধা নাম,
—মা, মা, বলে—কাতরা জননী উঠিবেন
জেগে;—চুম্বি মুখ, সন্তানে দিবেন কোল!"
ঐ শোন্ কি বোল বলিছে মাতা মোরে,
"পুত্র! বল দেখি সত্য করি, এতক্ষণ
বিকৃত ভাষায় কা'রা, বিকৃত বসনে,
বিকৃত স্বরেতে ডেকেছিল কার নাম?
—কিছু বুঝি নাই;—ডাকে ওষ্ঠাগত প্রাণ।"
দয়ারাম বলে ওহে ভজহরি ভাই—
মাতাকে পেয়েছে পেত্নি,—মড়া কয় কথা!
চলহ পলাই সবে এ কুস্থান হতে;
জীবন হারাই বুঝি এ শ্রাদ্ধ-সঙ্কটে!
ছাড়িব না পিণ্ড দান, চাঁদার আদায়!
হরি হরি বল সবে পালা হলো সায়।

সম্পূর্ণ।

বাঙ্গালী চরিত

দ্বিতীয় ভাগ।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৬ সাল।

সূচিপত্র।

বাঙ্গালী চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

পূজার চিঠি।

১২৯০ সাল, ১৫ই আশ্বিন, রাত্রি ৮টা।

(স্ত্রী, স্বামীকে)

প্রাণের নগেন,

আমি তোমায় এত পত্র লিখি, কিন্তু তুমি তার সময়ে উত্তর দাও না। তোমার জন্য মন যে কি করে, তা আর কি বল্‌বো। রোজ রোজ এক এক খানি তোমার পত্র পেলে তবুও কতক সন্তুষ্ট থাকি, কিন্তু তাতেও বঞ্চিত; সপ্তাহে দুখানি বৈ পত্র লেখ না। তোমার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুখিয়ে যাচ্চে; খেতে পারি না, মুখে অন্ন রোচে না, এ অধিনী কেবল সারাদিন তোমার জন্য ভাবে। সকালে ঘুম থেকে শাশুড়ী উঠিয়ে দিলে, অমনি যাহোক একটু জল খেয়ে তোমার জন্য ভাবি; স্নানের পর তিনি আবার জল খেতে দেন, না-পারি-না-পারি করে, অতিকষ্টে জল খেতে খেতেই তোমার কথা কত মনে পড়ে! তারপর মধ্যাহ্নে তিনি আবার সম্মুখে এক রাশ ভাত বেড়ে ধরেন, তাকি আমার আর পোড়া খিদে

আছে! কিন্তু কি করি, শাশুড়ী বকেন, রাগ করেন, তিনি যে আমাকে জ্বালা যন্ত্রণা-দেন, তাত তোমার অগোচর নাই! (সে সব কথায় এখন কায নাই; ঈশ্বর যদি দিন দেন তুমি ঘরে এলে সব কথা হবে) আমি কেবল তোমার খাতিরে তাঁকে কিছু না বলে, ভয়ে ভয়ে ভাতগুলি খাই! তখন যে কত কষ্ট হয়, সে কথা আর কি বল্‌বো—একে অনিচ্ছায় ভাত খেয়ে শারীরিক ব্যথা, তার উপর তোমার জন্য মানসিক কষ্ট! নাথ! তখন এই উভয় কষ্টে অচেতন হয়ে, বিছানায় শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়ি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তোমার কথা ভাবি—তাই কি এ পোড়া কপালে একটু সুস্থির হয়ে ঘুমাবার যো আছে যে, তোমার কথা একটু ভাববো আর কষ্ট লাঘব করবো? বলিলে বিশ্বাস কর্‌বে না, সন্ধ্যা না হতে হতেই শাশুড়ী আমাকে "উঠ উঠ সন্ধ্যা হলো" বলে জোর করে উঠিয়ে দেন। আমি কাঁচা ঘুমে উঠে চক্ষু মেলিতে পারি না, কেবল ঢুলি, এতেও নিস্তার নাই; তখন ঘরের সকল কাযই খুটি নাটি উনকোটি চোষট্টী কর্‌তে হয়—যেটী না কর্‌বো, সেটীত আর হবে না! আর শাশুড়ী তখন এক গাছা কাঠের মালা লয়ে, পা মেলিয়ে ব'সে, হরিনাম ঠক্‌ঠকাতে বসেন, কারো সঙ্গে কথা কন না; আমার যে তখন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠ্‌ছে, তা একবারও দেখেন না। নাথ! তখনও তোমার কথা ভাবি। এ সংসারে তোমা বই আর কাহাকেও জানি না। আমার যে এখানে এত কষ্টে দুঃখে কাল যাচ্চে, সেজন্য আমি কিছুই চিন্তিত নহি,—আমার ভাবনা, পাছে তোমার সেখানে কষ্ট হয়!

আজিকার ডাকে তোমার পত্র না পেয়ে মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। বড়-সাহেব সত্য সত্যই কি পূজার সময়ে তোমায় ছুটি দিবেন না? পূজার সময় তোমার বাটী না আসা হলে ত আমি বাঁচিব না। এ দাসী নিতান্তই প্রাণে মরিবে! এ সংসারে কিছুরই কাঙ্গালী নহি, কোন সাধ নাই, কেবল তোমার চরণ-যুগল দর্শনপ্রার্থী। নাথ! অধিনীর মুখপানে চেও। আমি পূর্ব্বের পত্রে যে সকল জিনিসের ফর্দ্দ দিয়ে ছিলাম, তাহার কিছুই চাই না, কেবল তুমি একবার এসো। পাছে তুমি মনে কর, আমি রাগ করেছি, তাই, যে দুই একটি জিনিস না হ'লে নয়, তাহারই ফর্দ্দ দিলাম। আমার জন্য এক খানি গুলবাহার ঢাকাই কাপড় আনিবে। দেখ যেন মুখুয্যেদের ছোট বউয়ের মত ঢাকাই হয়; ওবাড়ির বড়কর্ত্তা ঢাকা থেকে যেমন কাপড় আনিতেন, ঠিক সে রকম কাপড় হলেও চল্‌তে পারে। পূজার সময়ে পাঁচ-বাড়ীর বউ-ঝির সঙ্গে দেখা করিতে হয়, নেহাত খারাপ ঢাকাই পরে কেমন করে পাঁচ জনের সাক্ষাতে বার হ'বো! আমি নিজের জন্য তত দুঃখিত নহি, পাছে অপরের কাছে তোমার মুখ হেঁট হয়—এইটীই আমার বড় দুঃখ। কেহ যে, তোমার নিন্দা করিবে, তাহা আমি সহিতে পারিব না। আর এক যোড়া খুব মিহি, চটাল কালার পাছাপেড়ে লাল-বাগানে কাঁপড় চাই। এটীরও বিশেষ দরকার। প্রত্যহ একখানি ঢাকাই পরিলে লোকে বলিবে, বুঝি উহার ঐ খানি বৈ আর কাপড় নাই; পাছে কেহ তোমায় দোষে, ইহাই আমার ভয়। আর একটি আমার সাটীনের জামা চাই—সেত দেবার কথাই আছে। বাক্স, সাবান, পমেটম, তাস, পশম,

আতর, গোলাপ, লাবেণ্ডার,—ঘোষেদের মেজবৌয়ের মত একটি ভাল শিশি, হরি কাকার মত এক খানি ছুরি, ওবাড়ীর দামিনী দিদির মত এক খানি কাঁচি, গোলাপফুলের মত ৮টী কাঁচের পুতুল—এইগুলি সব মনে করে কিনো। আর একটা বিষয় মনে পড়িয়ে দি; পাক-দেওয়া বালা ও ফুল-ঝুমকাটী ভুলো না; আর বছরের মত পূজার সময়ে ষষ্টির দিন এসে যেন বলোনা—"সেক্‌রা দিলে না।" এবৎসর ওদুটি গহনা না হলে লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে! বিশেষ মল্লিকা দিদির এবারে ৪।৫ খানা নূতন গহনা হয়েছে; আমি যে তার কাছে সব পুরাতন সাবেক গহনাগুলি পরিব, তা কখন পরিব না। গহনা না পরিতে হয়, তাও স্বীকার; তবু সব পুরাণ গহনা পরিতে পারিব না। ভাল কথা মনে পড়িল—পুরাণ গহনাগুলি নূতন রং করাতে হইবে। তাহার শীঘ্র বন্দোবস্ত করে কলিকাতা হইতে লোক পাঠাইয়া দিবে। আর আমি কিছুই চাই না—কেবল একটি ভাই আছে, তাহার জন্য ধূতি, চাদর, জুতা জামা অবশ্য অবশ্য আনিবে; মায়ের জন্য এক খানি ভাল পাটের কাপড় আনিবে—মা তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করবেন! তোমার একে ৪০৲ টাকা মাহিনা; আর কিছু বেশী খরচপত্র করে কায নাই; বেশী কোথা পাবে? দুটাকা থাক্‌লে আখেরে কায দেখ্‌বে। আমার শাশুড়ীর জন্য এ বছর আর কাপড় আনিতে হইবে না; তিনি কাপড়ের মর্ম্ম বুঝেন না; গত বৎসর যে থান কাপড়খানি দিয়াছিলে, তাহাই, শাশুড়ী পুত পুত করে তুলে রেখেছেন। সে কাপড় পোকায় কেটে নষ্ট হতেছে, বস্তা পচা হতেছে, এমন দেবার দরকার কি আছে? সে এক

টাকা থাকিলে আমার মলের বাণির দেনা শোধ যাবে! কিন্তু তুমি খরচে-মানুষ বলে কিছুতেই তোমার কুলায় না। ঠাকুরঝির জন্যও কাপড় আনিতে হবে না—তুমি একলা মানুষ —কোথা পাবে?—পাঁচ জনকে লইয়াই তোমার ঝঞ্জট। আমি না হয় তাহাকে এক খানা আমার আর বছরের কাপড় দিব। বেশ বুঝেশুঝে খরচপত্র করিবে—অসময়ে কেউ দু-টাকা দেয় না। কিন্তু তুমি আমার কথা শুন কৈ?—আমার কথা শুনিলে কি এত দিন মলের বাণির দেনা থাকে; পূর্ব্ব পত্রে লিখেছিলে, আমার জন্য নব-বৃন্দাবন প্রভৃতি বই আনিবে; যদি খরচের টানাটানি হয়, তবে তাহা আর আনিয়া কায নাই। আমি এ সব বুঝি, বই না আনিলে রাগ করিব কি?—না; বুঝিব, তোমার সঙ্গতি নাই কোথা পাবে?—কিন্তু লোকে বুঝে কৈ? এইত আমার দুঃখ। অধিনীর নিবেদন ইতি।

তোমারই কুসুম।

পুনঃ—

আমি আশা-পথ চাহিয়া আছি। এ অবলার প্রতি দয়া করিয়া যেমন করে হউক, ছুটিতে পূজার সময়ে বাটী আসিবে। যদি আমার কপাল মন্দ হয়, যদি একান্তই না আসতে পার, তবে ফর্দ্দমত জিনীসগুলি পাঠাইতে যেন বিলম্ব না হয়, চতুর্থীর পূর্ব্বেই যেন পাই। এ দাসী তোমা বই আর কাহাকেও জানে না।

তোমারই কুঃ—

মহাগীতি।

আয় মা কল্পনা সতি! গাব প্রেমরসে
গৌড়ভূমে আজ নগেন-কুসুম-গীত—
এক ফোঁটা সুধা—আনন্দে করিবে পান
বঙ্গবাসী যত, নিরবধি। ত্রেতায় যেমতি
চোর রত্নাকর, কবি-রত্নাকর এবে
অতুল জগতে গেয়েছিল, মহা-গীত
রামসীতা কথা। ইংরেজী-এলেমহীন
চোর সে বাল্মীকি, তবু গেয়েছিল ভাল।
সাধু আমি—নারীরূপ হেরি নাই কভু
নয়ন ভরিয়া; জানি লাটীন ইংরেজী,
বাঙ্গালার ত কথাই নাই—অবশ্যই গাব ভাল।
তেঁই দেবি নমি তব পদে বারে বার
অবনী লুটায়ে! শুনিয়াছ মধু-মাসে
সহকার শাখে, কোকিল-কাকলী, মধুসম;
বাঁশরী স্বরলহরী যমুনা-পুলিনে,
নারদের বীণাধ্বনি কৈলাস-শিখরে;
কিন্তু শুন নাই কভু (সাহসি বলিতে পারি)
এহেন মধুর গীত; শুন মন দিয়া,
প্রাণ দিয়া, নরনারী যত, কলিকালে
বঙ্গভূমে; শুনেছিল যথা রাজা পরিক্ষীৎ
শুকদেব মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা,
দ্বাপর কলির সন্ধিকালে (শমীকের শাপে)

যমুনার কূলে ছিল যবে রাজ্য-পাট ছাড়ি।
পূর্ব্বের গগন-ভালে উদেছে অরুণ;
তামাক খাবার টীকে ধরাবে নগেন,
ঝড় ঝড় ঝাড়িছে চকমকি; চক্ চক্
চকিছে আগুণ; ফণিকণি দপে যথা
আন্ধার ভবনে; কিন্তু ভিজা সোলা হায়!
অব্যর্থ সন্ধান সদা হইতেছে ব্যর্থ!
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
গিয়াছিল স্বর্গপুরে ইন্দ্রের সদনে—
(হর-কোপানলে কাম যেনরে না পুড়ি)
সুন্দরী উর্ব্বশী ধনী ভেটেছিল পার্থে;
ব্যর্থ সুররঙ্গিণীর—অব্যর্থ সন্ধান—
করেছিল সে ফাল্গুনি দ্রৌপদী-মোহন।
হেন কালে উতরিল কুসুমের চিঠি
নগেনের হাতে, পত্র দেখে কাঁপে হিয়া,
শুকাইল মুখ—পত্র পড়ে অচেতন
ঘোর; বীরবাহু-শোকে লঙ্কাপতি যথা।
উঠি পুন বিলাপিলা বহু, ক্ষীর স্বরে;
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি,
তাও বুঝি ছিঁড়ে লয় কাল এ অকালে,
বৃথায় মানবজন্ম ধরেছিনু আমি,
প্রেয়সীর আশা কভু নারিনু পূরাতে;
ইচ্ছি, তুষানলে জুড়াই মনের জ্বালা,
—এদারুণ জ্বালা যদি পারি নিবারিতে;

অথবা অজ্ঞাতবাসে যোগীবেশ ধরি
ফিরি দেশে দেশে দ্বাদশ বৎসর কাল!
হায় বিধি, জন্মমাত্র আঁতুড়-আগারে—
সৈন্ধব লবণ কেন দেয় নাই মুখে
ছুষ্টা ধাই; দীন আমি অকৃতী অধম;
দয়াময় বিভু! ডাকিহে ডাগর ডাকে
কোথা দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ প্রভু!
তিতি অশ্রুনীরে; ভিজে গণ্ডস্থল; ভিজে
গোঁফ দাড়ি; ভিজে বক্ষ, কক্ষ; ভিজিলরে
কাপড় চোপড়! বহিল শোকের কালাপানি?
যথা যবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধন
আদি শত পুত্র হলে হত, কেঁদেছিল
গান্ধারী জননী। হেন কালে সখা তার
নাম নরহরি, এক পাঠশালের পড়ো,
এবে এক আফিসের সহচর; উপনীত
হলো; জিজ্ঞাসিল "বন্ধু! বল বল
মুখশশী মেঘাবৃত কেন? মন্দাকিনী
রাধা কেন নয়নের কোণে? কি হয়েছে?
মেরেছে কি কেউ?" উত্তরিল শ্রীনগেন্দ্র
"শুন সখে, মর্ম্ম-কথা মারে নাই কেহ—
আপনার দোষে সদা খাইতেছি মার;
স্বখাদ সলিলে পড়ে হাবুডুবু খাই—
হায় সখে! কি আর বলিব সে বারতা,
স্মরিলে সে কথা হৃদি কাঁপে গুরু গুরু—

ফুটেছে হৃদয়-বৃন্তে একটি কুসুম,
কিন্তু মরুময় হৃদে বল কত দিন
আর সে তিষ্ঠিবে? শুখাবে কুসুম এবে,
শুখাবে হৃদয়? শুখাইবে সেই সঙ্গে
বন্ধু তব; হায়! কোথা সে বালক-কাল—
ধূলিখেলা করিতাম যবে পথে পথে!
আন ভাই হলাহল ভখিয়া মরিব,
কিম্বা জ্বাল অগ্নিকুণ্ড পশিব তাহাতে
এ অন্তিমে বন্ধু-কায কর তুমি ভাই।"
এতেক বিলাপি বন্ধু, দিল বন্ধু-হাতে
কুসুমের পত্র। হরিহর পড়ি পত্র,
বুঝিল সকল। বলিলেন, ধীরে ধীরে,
"দেখিতেছি বিধি বাম, রন্ধ্রগত শনি।"
ক্ষণেক নিস্তব্ধ দোঁহে, কতক্ষণ পরে
কহিল নগেন্দ্রনাথ সকাতর স্বরে—
"দুটি ডিক্রী ঝুলিতেছে মস্তক উপর
স্বর্ণকারের। ভীটা, মাটী, বাটী বাঁধা—
জানত সকলি—মাহিনার কীস্তিবন্দি।
জুতাবুরুষের কড়ি হাতে নাই মোর—
জল খাই ভাঁড়ে, নিজে রাঁধি, শুই চটে,
উনানে পাড়িয়া ফুক চোখে ঝাপ্সা দেখি
—না লিখিল মৃত্যু কেন বিধাতা ললাটে।"
উত্তরিল হরিহর—"বলি শুন, যাও
গৃহে; বুঝাও কুসুমে—অবোধ সে নয়,

তোমাগত প্রাণ—দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ
তার।" বলিল নগেন্দ্র, "আশ্বাসে রেখেছি
তারে বার মাস—আজ কেমনে বলিব,
পাপী আমি—"কিছু নাই সব শূন্যাকার!"
প্রিয়া রোষিবেন যবে, কে রোধিবে তবে
সেই রোষ-গতি—কে রোধে নদীর গতি
যবে ধায় সেহ সমুদ্রের পানে দ্রুত?
দেখিয়াছি দ্রুত ইরম্মদে ধেয়ে যেতে
আকাশের পথে; দেখিয়াছি বাজবৌরির
গতি; দেখিয়াছি নক্ষত্র পতন; কিন্তু কভু
দেখি নাই আমি (দেখে নাই কেহ কভু)
প্রিয়ার সে রোষগতি। ভাই! ধরি দাও
দুটী টাকা, পলাই এদেশ হতে শীঘ্র"।
বন্ধু দিল টাকা, পলায় নগেন্দ্রনাথ,
একছুটে কাঁদিতে কাঁদিতে,—যথা যবে
মহাভারতের শেষে আশ্রমিক পর্ব্বে—
সঞ্জয় গান্ধারী আর কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র,
সংসারের মায়া ত্যজি গিয়াছিল বনে
কলেবর পরিত্যাগ হেতু। ফুরাইল কথা
এত দূরে। সতেজে লিখিনু ছন্দ বীরদাপে;
পার্থিব অক্ষর কভু না করি গণনা,
মহাকবি মোরা; আর কিছু দিন পরে
লিখিবগো ঢালা (গদ্য সম) ব্লাঙ্কভার্স—
গৌড়জন যাহে সদা যাবে গড়াগড়ি।

তত্ত্বকথা।

(১)

দত্তপুরের পালেদের বাড়ি পূজার ভারি ঘটা; ১২ মণ ময়দার বরাদ্দ; এক দল যাত্রার বায়না ৪৫০ টাকা। সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুরনিবাসী কৃষ্ণধন মুখুয্যেও পূজা আনিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তাবুড়া বড় কৃপণ, ছেলেদের ইচ্ছা একটু জাঁকজমক হয়। লোকে বলে, বুড়া যকের ধন আগুলিয়া আছে, কার টাকা খরচ করিবে? অতি কায়ক্লেশে গোছে পাছে তিনি পূজাটি মাত্র আনিয়াছেন। নীলমণি ঠাকুর সপ্তমী পূজার দিন বেলা ১টার সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া কৃষ্ণধনের বাড়ি উপস্থিত। বুড়া জিজ্ঞাসিল "কেন হে কি হয়েছে, এত হাঁপাইতেছ কেন? নীলমণি উত্তর করিল— "মহাশয় বলব কি, বড় বিপদে পড়েছিলাম, ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়েছিল—আগে একটু জল দিন।" বুড়া—"দিচ্চি দিচ্চি— একটু বিশ্রাম কর, হয়েছিল কি বল দেখি?" নীলমণি— "আজ্ঞে আর একটু হলেই মারা পড়েছিনু—পালেদের বাড়ী পূজা দেখ্‌তে গেলাম, পূজা বাড়ীতে ঢুকেই প্রাণ বার হবার উপক্রম হলো, লোকের কলরব, ঘিয়ের গন্ধ, দই ক্ষীরের কাদা, সন্দেসের ছড়াছড়ি, কাঙ্গালির ভড়াহড়ি—দেখে শুনে আমার ত্রাহি ত্রাহি ডাক উপস্থিত হলো—কি করি, বাহিরে আসিতে পারিলে বাঁচি, ভাবিলাম! কোথায় গেলে রক্ষা পাই—তাই দৌড়িয়া আপনার বাড়ী পলাইয়া আসিয়াছি। আহা! এখানে মায়ের কেমন প্রশান্তমূর্ত্তি, কোন গোলটি নাই—কি সুখেরই

স্থান! মাতঃ জগদম্বে! তুমিই যথার্থ দুর্গা, তোমাকে শত শত প্রণাম।”

(২)

বড় বাড়ীর বারাণশী মিত্র খুব জাঁকজমকে পূজা আনেন। নিমন্ত্রণপত্রে সহর ছাইয়া দেন; কি ছোট, কি বড় কাহারাও বলিবার যো নাই যে, তাহার পত্র আসিল না। তবে দুষ্ট লোকে শেষে কাণাকাণি করে যে, বারাণশী বাবু মাছের তেলে মাছই ভাজেন এবং অবশিষ্ট তেলটুকু গড়াইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দেন। দেশের লোকের স্বভাব মন্দ, তাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়। কিন্তু বাবু বড় সমদর্শী লোক, সকলের উপর সমান ভাব—যে যেমন, তার উপর তেমনি দয়া। কেমন সুচারু বন্দোবস্ত! যে যেরূপ লোক, তার তেমনি সম্মান রাখেন। তাঁহার তিন রকম জল খাবার সাজান আছে—পাছে উচুঁ নীচু হয় বলিয়া স্বয়ং সে বিষয়ের পরিদর্শনে নিযুক্ত আছেন। যিনি ১৬৲ টাকা কিম্বা তদধিক প্রণামী দেন, তাঁহার জন্য ফাষ্টক্লাস জল খাবার;—লুচি, তরকারি, ডাল, মেঠাই, মতিচুর, অমৃতি, রসগোল্লা, নিমকী, খাজা, গজা, বরফী, মণ্ডা, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। রৌপ্যপাত্রে জল—মখমলের আসন—গোলাপী খিলি—অম্বরী তামাক। ৮৲ টাকা কিম্বা তদধিক দিলে, সেকেণ্ড ক্লাস;—৮ খানি লুচি, তদুপযুক্ত তরকারি, ১টী মতিচুর, ২ খানি জিলিপি, কম্বলের আসন, বাজারে পান, ভেলসা তামাক। ১৲ টাকার অধিক দর্শনী—তৃতীয় শ্রেণীর জল খাবার;—দুই লুচি এক পয়সা মূল্যের ৪ ক্ষুদ্র গজা, ১টী মেঠাই, তরকারি নাই, ভাঁড়ে

জল, কুশাসন, খানকতক স্থপারি, একটান তামাক। বারাণশী বাবু বেশ সূক্ষ্মদর্শী—হিসাবমত, যুক্তিমত এইরূপে ন্যায়ের অনুগমন করেন; কিন্তু অসভ্য অশিক্ষিত লোকের এমনি দশা মন্দ যে, নিমন্ত্রণ পত্রখানি পাইলেই আহারের লোভে পূজা দেখিতে যায়; অন্ততঃ তৃতীয়শ্রেণীর দর্শনী লইয়া যাওয়া যে উচিত, তাহা একবার মনেও ভাবে না। বারাণশী বাবু কি করিবেন!—দুষ্টের দমন না হইলে দেশ রক্ষা হয় না, তাদের যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। শুধু হাতে গেলে, শুধু মুখে ফিরিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। (N. B.—শুধু হাতে অর্থে—১৲ টাকা বা তাহার কম দর্শনী)। সপ্তমী, অষ্টমী, এইভাবে অতীত হইল। নবমীর দিন, চটি জুতা-পায়ে পিরান-হীন অঙ্গে একটা বিটল ব্রাহ্মণ একটী দুয়ানি প্রণামী লইয়া উপস্থিত। বারাণশী বাবু সে অভদ্রের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? ব্রাহ্মণের কড়চে দুয়ানি দেখিয়াই আপনাকে নিতান্ত অবমানিত বোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—অপরে ঝড়াঝড় টাকা ফেলিতেছে, এবং যে যে ক্লাসের লোক, তাহাকে সেইরূপ আহার দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণ তখন কি একটা বুঝিল। উঠিয়া, গললগ্নীকৃতবাস হইয়াই ভগবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই দুয়ানিটী মায়ের পাদ-পদ্মে ধরিয়া করুণস্বরে বলিল,—"হে! মহার্ঘ্যদরে জলখাবার বিক্রয়-কারিণী মা! গরীব ব্রাহ্মণ—বড় ক্ষুধা—যা পার মা, এই দুয়ানীর মত জল খাবার দাও"। বাবুর পারিষদবর্গ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—বেল্লিক ব্রাহ্মণ করে কি? পাগল নাকি? ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—"ভাই সকল হে! পাগল নহি—বড় ক্ষুধা—পেটের দায়!

মহামায়া তোমাদের বাবুকে এত টাকা রোজগার করিয়া দিচ্ছেন, আমাকে কি আর দু আনার লুচি দিতে পারিবেন না ?"

বড়বাবুর চিঠি।

(বিজয়ার পর।)

৺পূজার গোলমালে আমার দেশহিতৈষী কাষের ব্যবসাটা একটু মন্দা গিয়াছিল। অসভ্য দুর্গাপূজাকারীরা (Doorga-poojamakers) তখন পুতুলের গায়ে নশ্বর পার্থিব রং দিতেই ব্যস্ত ছিল। তাহারা তখন দেশের পানে একেবারেই চাহে নাই।—বর্ব্বর বাঙ্গালা নিতান্ত বহিয়া গিয়াছিল, মুর্খতার সহিত উন্মত্ততার যোগ হইলে, যে বিষময় ফল ফলে, তাহাই ঘটিয়াছিল। কেহ বস্তা বস্তা কাপড় কিনিতেছে, কেহ হাঁড়া হাঁড়া সন্দেস দর করিতেছে, কেহ জালা জালা দয়ের বায়না দিতেছে, কেহ স্ত্রীর জন্ম অলঙ্কার গড়াইতেছে। এসব কি এ ? ছি! আমি জানি, অসভ্য দেশে পুতুল পূজা থাকিবে ; তা, বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবটা যে এখনও কিছুদিন থাকিবে, তৎপক্ষে কিছু সন্দেহ নাই ; তজ্জন্ত তত দুঃখ করি না, কিন্তু আসল কষ্ট এই ঐ সময় লোক গুলা এত উন্মত্তবৎ বিব্রত হয় কেন ? পুতুল পূজা করিবে, আস্তে আস্তে করুক,—নিঝুম নীরব ভাবে হিন্দুরা পূজা করুক, তাতে আপত্ত করি না। এ মোশাই, একটা ঢাক ঢোল কাঁসি বাজায়ে দেশ তোলপাড় করে তোলে—ছুটীর ক দিন ত কাণ পাতিবার যো নাই। বিশ্রামের জন্ম ছুটী। সেই

বিশ্রামের বদলে যখন কেবল পরিশ্রম—কেবল ছুটাছুটী, হুড়া-হুড়ি, মারামারি, তখন ছুটীর সম্মান, গৌরব, স্বার্থকতা থাকে কোথা? কোথাও দেখিবে, সন্দেস লইয়া কেহ ভাটা গড়াই-তেছে, কোথাও সুখোদয়ের কাদা, কোথাও ক্ষীরের কোটালে বাণ, কোথাও কাঙ্গালী বিদায়ের জঘন্য বিকট কলরব, কোথাও অন্নছত্রের ভাতের আসুরিক দুর্গন্ধ—এ ক্ষণভঙ্গুর প্রাণে এত কি সহ্য যায়? হিন্দুরা যদি প্রতি বৎসরই এই ভাবে চলে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উচিত, ছুটী বন্দ করিয়া দেওয়া। যদি গবর্ণমেণ্ট একান্তই ছুটী বন্দ না করেন, তাহা হইলে অবশেষে আমি এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইব। অত-এব সাবধান!

ছুটীর সময় এ বৃথা গোলযোগে কত দিকে ক্ষতি দেখুন। বাজারে জিনিসপত্র হঠাৎ মহার্ঘ্য হয়। ইহাতে দেশের গরীব লোকের যে কত কষ্ট হয়, তাহা ভাবিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। গরীব চাসা লোক টেক্সের দায়েই বিব্রত—তাহার উপর এই হঠাৎ মহার্ঘ্যদরে জিনিস কিনিতে তাহারা পয়সা পাবে কোথা? আহা! তাহারা মাথার ঘাম দ্বারা তাহাদের রুটী উপার্জ্জন করে। রৌদ্র, বর্ষা, শিশির, শীত, অগ্নি, ঝড়, সর্প, ব্যাঘ্র, না মানিয়া তাহারা সুবৃহৎ ধানবৃক্ষ তৈয়ারি করে। শেষে ধান গাছে উঠিয়া ধানফল পাড়িতে তাহাদিগকে কত কর্ম্মভোগই না করিতে হয়! হায়! সে সব কথা স্মরণ করিলেই আমার বুক ফাটিয়া যায়! হায়! আমি চাসাকুলের কবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব? হা ঈশ্বর! এমন দিন কি আসিবে না, যবে চাসালোককে আর প্রত্যহ

মাঠে এক হাঁটু কাদা ঘাঁটিতে হইবে না, প্রত্যহ মাঠে ভিজিতে হইবে না,—এমন কি তাহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর ধানবৃক্ষের তলায় একবারও যাইতে হইবে না। কবে তাহাদের পায়ে বিলাতী বুট দেখিব, গায়ে বিলাতী দরজীর তয়ারি বিলাতী কাপড়ের বিলাতী কোট দেখিব, মাথায় বিলাতী ছাতা দেখিব, মুখে বিলাতী চুরট দেখিব, শিরে শোলার বিলাতী হ্যাট দেখিব, গলায় বিলাতী গলবন্ধ দেখিব, হাতে বিলাতী কেতাব দেখিব? চাসা এবং বিধবা আমার এ জীবনের প্রধান লক্ষ্য! কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু কি এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিধবাকে মাছ খাইতে দিবে না? কি কুটিল স্বার্থপরতা দেখ দেখি? মাছ বা মাংস অঙ্গের যে পূর্ণতা সাধন করে, তাহা কি তাহারা বুঝে না? গরীব বিধবা পতি-ধন হারাইয়াছে বলিয়া কি সে মাছ ধনও হারাইবে?

এ বঙ্গে কি কোন সমাজিক-ম্যাটসিনি নাই? যদি থাকেন, তিনি আমার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিন, আমি তাঁহার সহিত 'সেকেণ্ড' করিব। হায় হায়! কি দুঃখ! বিধবার পায়ে আল্তা নাই, গজেন্দ্রগমনে চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার পায়ের চারি গাছা মল ঝম্ ঝম্ বাজে না; শান্তিপুরে নীলাম্বরী মিহি কাপড়ও তিনি পরিতে পান না—সেই মোটা গোধড় থান কেবল কোমলাঙ্গের কষ্টদায়ক! আমি একলা—চারি দিকে লক্ষ লক্ষ বিধবা কজনকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব? তাই কেবল কাঁদি।

কি কথা বলিতে বলিতে, কি কথা আসিয়া পড়িয়াছে। মনের আবেগ এমনি! দ্বিতীয় ক্ষতি—বাণিজ্যের। পূজার সময় হঠাৎ বাজার মহার্ঘ্য হওয়ায় সমগ্র সওদাগরবৃন্দের ক্ষতি।

একথা প্রমাণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। কামস্কট্কা, জুলুদেশ, টিম্বক্টু, খার্তুম এবং আইসলণ্ড—এই পাঁচ স্থানের পাঁচ জন প্রধান পণ্ডিত একমতাবলম্বী হইয়া বলিয়াছেন, "হঠাৎ জিনিস মহার্ঘ্য হইলেই ব্যবসার ক্ষতি।" সুতরাং এ কথায় প্রতিবাদ নাই। ভারতে এরূপ দুঃসাহসী ব্যক্তি কেইবা আছে, যিনি ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত খণ্ডন করিয়া ঔদ্ধত্য দেখাতে পারেন? অতএব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণীকৃত হইল, ব্যবসার ক্ষতি।

তৃতীয় ক্ষতিটা বড়ই গুরুতর। সকলে প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, নচেৎ এ গভীর তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন হইবে। ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হিন্দুসন্তান, পূজার সময়, বুড়ো মা বাপ, যুবতী ভগিনী ও ভাতৃজায়া প্রভৃতির জন্য অম্লানবদনে বস্ত্রাদি খরিদ করে! কিন্তু ইহাতে যে স্বাবলম্বন বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা একবার সে ভুলেও ভাবে না। এই কুরীতি প্রচলিত থাকার দরুণই, ভারত আজ পরপদানত। আমি রোজগার করিব, অপরে বসিয়া খাইবে, আমার মুখটী পানে চাহিয়া আলস্যে কাল কাটাইবে—বঙ্গের এ জঘন্য প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত গর্হিত। মাতাই হউন, আর পিতাই হউন,—কেহ যে পর-প্রত্যাশী হইয়া জীবন যাপন করিবেন; ইহা আমি অনুমোদন করিতে পারি না। মা বুড়া হইয়াছে, বেশ কথা! খাটিবার শক্তি নাই, আরও উত্তম! সে বোসে বোসে কার্পেটের কায করুক্। যদি বল, মায়ের চোখে চাল্‌সে ধরিয়াছে, ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, আচ্ছা, তাতে ক্ষতি নাই,—সে চস্‌মা ধরুক্। লরেন্স-কোম্পানীর বাড়ী

থেকে আমি তাকে চস্‌মা কিনে দিতে রাজী আছি, কার্পেটের কাযের জন্য, উপযুক্ত জামীন লইয়া, মূলধন দিতেও অনিচ্ছুক নহি, কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে একটী পয়সাও দিতে পারি না। এরূপ দানে লোকের মনে ভিক্ষা বৃত্তির লালসা বলবতী হয়। ভিক্ষুক তৃণ অপেক্ষাও লঘু। বাঙ্গালী ক্রমশ এরূপ লঘু হইয়া পড়িলে দেশ-উদ্ধার কে করিবে? কিন্তু এদিকে দেখ, মা কার্পেটের কায আরম্ভ করিল, মাসে দু জোড়া করিয়া জুতা বুনিতে লাগিল মহাজনের টাকার সুদ দিয়া পশমের দাম বাদে মাসে আড়াই টাকা স্বয়ং তাহার রোজগার হইল!—ইহাতে তার কত সুখ ভাব দেখি? মা যখন আপন পরিশ্রমলব্ধ ধনে নিজ রুটী তৈয়ারি করিবে,—তখন তাহার চক্ষু দিয়া কি আনন্দাশ্রু দরদরিত ধারে বহির্গত হইবে না? সে রুটী তাহার তখন কত মিষ্ট লাগিবে! বিশেষ, পরিশ্রম ব্যতীত ক্ষুধা হয় না; অক্ষুধায় খাইলে হজম হয় না! হজম না হইলে পেটের অসুখ হয়; পেটের অসুখ হইলে, গৃহস্থের কষ্ট, প্রতিবেশীর কষ্ট মিউনিসিপালিটীর কষ্ট,—আর নারীজাতি বৃদ্ধ বয়সে পেটপীড়াগ্রস্থা হইলে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবিনী হয় না। সুতরাং মায়ের আসন্ন-মৃত্যু; আমি উপযুক্ত সন্তান; কেমন করিয়া জীবিত মাকে মৃত্যুপথে পাঠাই বল দেখি? মা কার্পেটের কাযের কারখানা খুলুক্, ঐকান্তিক মনে জুতা বুনুক্,—ইহাতে আহার ঔষধ দুই হইবে—পরিশ্রমজনিত ক্ষুধার উপর স্বোপার্জ্জিত ধনলব্ধ সুমিষ্ট রুটী পড়িলে, তাহা একেবারে গলিয়া দ্রব হইয়া যাইবে, মায়েরও শরীরের পুষ্টিসাধন হইবে। এ দেশের হিন্দুরা এ সব কথা বড়

বুঝে না, গভীর দার্শনিকতত্ত্ব মোটেই চিন্তা করিতে তাহারা অক্ষম। তাহারা মা বাপকে আলস্যে কাল কাটাইতে দেখিলেই বড় সুখী হয়,—মা বাপ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাক্‌বেন, আর আমি রোজগার করে আহার যোগাইব, পরিধেয় বস্ত্র যোগাইব? ছি! স্বাবলম্বন বৃত্তিটা কি দেশ থেকে একেবারে উঠে যাবে? দেশ কি মাটী হবে? এ ঘোর দুর্দ্দশা আমি কখনই চক্ষে দেখিতে পারিব না। আমাদের ইংলণ্ডে, ইংরেজ-বাপ, ইংরেজ-মা, কি ভাবে চলেন, একবার স্থিরচিত্তে ভাব দেখি? সন্তানের চাকুরী স্থানে, ইংরেজ-মা-বাপ উপস্থিত হইলেন, দু দিন বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটাইলেন,—প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত। পুত্র তৎক্ষণাৎ মা বাপের আহারের দরুণ একখানি বিল পিতার সম্মুখে ধরিল। পিতাও বেশ উপযুক্ত। তিনি হিসাবে ভুল আছে কি না, ইহা অঙ্ক পাতিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন হিসাবের গোল মিটিল, অমনি তৎক্ষণাৎ একখানি চেক কাটিয়া দিয়া পিতা আহারীয়-দেনা পরিশোধ করিলেন। আহা! কেমন সুবন্দোবস্ত! কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। স্বাবলম্বন বৃত্তির কি অপূর্ব্ব মহিমা! আর এই যত আপদ, এই পোড়া দেশে! কোথাও কিছু নাই, এই পুতুল পূজার সময় হঠাৎ আমি মা বাপকে কাপড় দিব কেন? তারা পারে, আপনারা রোজগার করিয়া কাপড় কিনুক। আমি তাহাদের চির-আলস্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য কাপড় কিনিয়া দিব কেন? যে স্বাবলম্বন বৃত্তির জোরে ইংরেজ আজ পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, সেই বৃত্তির মূল-শিকড়ে আমি কি আজ কুঠারাঘাত

করিব? তবে হাঁ, আমি নিজ-নারীকে সমস্তই দিতে বাধ্য। স্ত্রীকে উত্তম উত্তম কারুকার্য্যসুশোভিত পরিধেয়বস্ত্র, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুস্বাদু সারগর্ভ আহার্য্য বস্তু, এ সমস্তই ভূতকালে দিয়াছি, বর্ত্তমানে দিতেছি এবং ভবিষ্যতে দিব। কারণ বিবাহের ইহাই চুক্তি। আমি এ চুক্তি ভঙ্গ করিলে স্ত্রীও বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারেন। চুক্তির আইনের নিয়ম এই, কোন চুক্তি স্বেচ্ছায় আংশিক ভঙ্গ করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব পুরুষজাতিকে স্ত্রী জাতীর সহিত ব্যবহারে বড়ই সাবধানে চলিতে হয়। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, স্ত্রীর বাক্যই বেদ। স্ত্রীর বাক্য বেদবৎ না মানিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে; সুশীলা, সুবোদ্ধা, সুন্দরী শ্যালিকাগণকে আশ্বিন মাসে বহুমূল্যের বস্ত্রাদি ও প্রচুর মিষ্টান্ন প্রদান করি বটে, কিন্তু তাহা স্ত্রীর সৎপরামর্শে। ইহার জন্য আমি দায়ী নহি। স্ত্রীর বাক্য-লঙ্ঘন আইনে নিষিদ্ধ। সুতরাং আইনে বাধ্য হইয়া আমাকে একায করিতে হয়। সেই অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রণয়িনী আমার মা বাপের কাপড় দিতে অনুমতি করুন, আমি এখনি দিব। ইহার যদি কখনও প্রতিবাদ করি, তবে আমার দোষ দিও।

চতুর্থ-ক্ষতি বড়ই বিষম। দুধ, অসভ্য হিন্দুর হাতে পড়িয়া মাটী হয়। ছানা দুধের বিকার। কোন গুণ নাই, অসার! সেই ছানায় কতগুলা চিনি ফেলে হিন্দুরা মিঠাই তৈয়ারি করে। পূজার সময় সেই মিঠায়ের ছড়াছড়ি হয়। কেবল পয়সা নষ্ট এবং উদরের কষ্টদায়ক। আরও দেখ, দুধে ছানা তৈয়ারি হওয়ায় দুধের দাম চড়িয়া যায়। চায়ের জন্য দুধ কেবল মাত্র

উপযোগী। দুধ মহার্ঘ্য হওয়ায়, জনসাধারণ আর চা দিয়া দুধ খাইতে পায় না। ইহাতে ভারতীয় চাসা-লোকের উন্নতি, না অবনতি? আচ্ছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, মিঠাই খাইতে পয়সা খরচ হয়, সেই ব্যয়ে পূজার সময় কট্‌লেট, কারি, চপ খাইতে ক্ষতি কি? ফাউল অতি উপাদেয় জীব—কেবল মূর্খতার দরুণ, হে হিঁদু! তাহাতে বঞ্চিত হও কেন! বিশেষ তোমরা এখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, অতি দুর্ব্বল, পূজার তিন দিন ঢালাও চিকেন-ব্রথ খাওনা কেন? কুসংস্কারে পড়িয়া হরি নাম কর, আপত্তি নাই, কিন্তু চিকেন ব্রথ্‌ না খাইলে হরি নাম করিবে কার জোরে? কেবল চিনির ডেলা মিঠাই খাইলে যে ডাইবিটিস্‌ হইবে,—এ ভাবনা কি একবারও ভাব না? সম্মুখে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখ। আমি একলা, তোমাদিগকে কত বুঝাইব!

হায়! দেখিলাম, দেখাইলাম, বুঝিলাম, বুঝাইলাম, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবটা অতি বদ জিনিস। পুতুল পূজা করুক, কাপড় কিনুক, ছানা চিনি খাউক এসবে তত আপত্তি করিতাম না, যদি পূজাবকাশে বাঙ্গালী একটু সুস্থির হয়ে আমার দেশ ভক্তির বক্তৃতা শুনিত! কিন্তু অধঃপতনশীল বাঙ্গালী তা শুনিল কৈ? মনে করিলাম, বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া এ সময় উত্তর-পশ্চিমে যাই, তথায় আমার কাযের বিশেষ সুবিধা হইবে। পোর্টমেণ্ট পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছিলাম, এমন সময় বিধি বাদ সাধিল। এলাহাবাদ হইতে তারে সংবাদ আসিল, এখানে মহরম উপস্থিত—এখন কিছু এখানে সুবিধা হবে না, আসিও না। লাহোর হইতে সংবাদ পাইলাম, এখানে হিন্দু মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা—এবার এলেই মার খেতে হবে। দেখে শুনে আমার

হৃদয় দমিয়া গেল। এ দিকে দুর্গোৎসব, ও দিকে মহরম, আমি যাই কোথা? আমার চলে কিসে? ব্যবসা যে বন্ধ হয়! আমার ডাক ছেড়ে কান্না পাইতেছে! অগো তোমরা কেউ আমাকে কিছু উপায় বলে দিবে গো?

গহনা-রহস্য।

সুমুখীর নারী জন্মটা বৃথা গেল! স্বামী অলঙ্কার ত দিতে পারে না। স্বামী কাছারী থেকে এসে শুধু "প্রিয়ে!" সম্বোধন করিলে ত দুঃখ ঘুচে না। বোসেদের বাড়ী বিবাহ উপস্থিত, বোসেদের গিন্নি তাঁহাকে আনিবার জন্য দুই দফা পাল্কী পাঠাইলেন—কিন্তু স্বামী এমনি অবুঝ অকর্ম্মণ্য, নিষ্ঠুর যে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে গহনা গড়াইয়া আনিয়া দিতে পারিল না। সুমুখীর আজ দুঃখের অবধি নাই, দুঃখের এক বারে প্যাসেফিক্ ওসেন, ধু ধু একাকার, কুল কিনারা নাই। গহনা অভাবে সইয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে পারিলেন না,—এই হৃদয়-কুসুমশোষী দারুণ দুর্ভর দুঃখে সুমুখীর নয়নকোণ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা উভয় গণ্ডে পতিত—যেন প্রফুল্লিত পঙ্কজে শিশিরবিন্দু, মরি, মরি!

নিদয় বিধাতা কেনরে তাহারে,
ভারতে পাঠালে রমণী করে রে!

এ যন্ত্রণা শূল ব্যাধির গুরুতর যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর! সুমুখীর ঢের সহ্য গুণ—তাই সুমুখী এখনও দাঁড়াইয়া আছেন, নচেৎ

গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া এতক্ষণ জীবাত্মাকে পাপ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেন।

সুমুখীর স্বামীর নাম ভজহরি—তিনি নব্য-বঙ্গ, এম এ, বি, এল—উকীল।

ঐ অনারারি পদে তিনি আজ কিছু কম এক বৎসর প্রতিষ্ঠিত। ভজহরি এদিকে ছেলে ভাল; কিন্তু এত লেখাপড়া শিখিয়াও যে তাহার কথার ঠিক থাকে না, ইহাই বড় পরিতাপের বিষয়। যখন তিনি বিয়ে ক্লাশে পড়েন, তখন অবধি সুমুখীকে লোভ দেখাইতেন যে, বি, এ, পাস করিতে পারিলেই গহনা দিব। বি এর পর, এম, এ—তখনও কিছু সুবিধা হইল না। তথাচ সেই মিথ্যাবাদী পুরুষ সরলা রমণীকে লোভ দেখাইতে ছাড়ে না—সুমুখীকে বলিলেন—"প্রিয়ে! নিশ্চয় বলিতেছি, যে দিন উকীল হইব, তার পর দিন এক সুট গহনা দিব"। তার পর কালক্রমে উকীল হইলেন, সুমুখীর আশা-পথ বিকসিত হইয়া উঠিল। ভজহরি বাবু প্রথমে যে দিন বাহালি পরওয়ানা হাতে করিয়া শামলা আঁটিয়া কাছারী যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহারই কথামত সেই দিন সুমুখী এক খানি গহনার ফর্দ্দ তাঁহার হাতে দিলেন। স্বামী হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীর হাত হইতে গহনার ফর্দ্দ গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিন্তু এঘটনার পর এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভজহরি এমনি পাষণ্ড, গহনা দূরে যাউক, ফর্দ্দখানি পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিয়াছেন। (বলেন হারাইয়া গিয়াছে) ছি! ভজহরি! এই কি তোমার ধর্ম্ম?

তার পর সুমুখীর সয়ের কন্যার বিবাহ স্থির হইল ;—ভজহরি ফের বলিলেন,—বিবাহের পূর্ব্বে চিক্, চুড়ি, মাথার ফুল—এই তিনটি নূতন গহনা দিবই দিব। আজ সেই বিবাহের দিন। এখনও গহনা পান নাই। সুমুখী কি স্বামীর নামে, ফৌজদারী আদালতে বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযোগ করিতে পারেন না? আর মনকষ্টের ও মানহানির ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানি আদালতে আর এক নম্বর নালিষ্ করিতে পারেন না ?

সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে ; সুমুখী গহনা পান নাই, নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে পারেন নাই ; কিন্তু সয়ের মেয়ের বিবাহে না গেলেও নহে—কি করিয়াই বা যান, নূতন গহনা নাই—সব পুরাতন,—তাঁহার সেই বিবাহ-কালের গহনা। মহা বিপদ ! তবে এখনও এক আশা আছে ; স্বামী অদ্য কাছারী না গিয়া গহনার অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন।

ওদিকে ভজহরির আজ দশ দিন উদরে অন্ন নাই—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, কাছারী যান নামমাত্র ; বেছারা মারা পড়িবার উপক্রম হইল—ঘরের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, কাছারীর অবস্থাও তদ্রূপ। যাহা হউক সেইদিন কি উপায়ে মাতৃ-পিতৃদায় অপেক্ষা গুরুতর—এ পত্নীদায় হইতে উদ্ধার হইবেন, ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। ঠিক করিলেন, বাস্তুভিটা বন্ধক দিলে এ কার্য্য যদি উদ্ধার হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু কেমন কপালের দোষ, তথাচ কোথাও টাকার যোগাড় হইল না। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্তু তিনি ঘরে আসিতে পারেন না, বাড়ীর দিকে আর পা উঠে না—গহনা

বিনা কি বলিয়া ঘরে ঢুকিবেন, ভাবিলেন আর ঘরে যাইব না, বিবাগী হইব—এই বলিয়া আদালতের নিকটবর্ত্তী বাঁধা ঘাটের চাঁদনীতে বসিলেন।

এখন স্ত্রীর মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, স্বামী কখন্ আসেন কখন্ আসেন, এই চিন্তায় পথপানে চাহিয়া আছেন, কিন্তু রাত্রি ৮ টা বাজিল, তখনও স্বামীর দেখা নাই। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর সকলই জুয়াচুরি, তখন সুমুখী উন্নত-ফণা সর্পিণীর ন্যায় বিষম গর্জ্জাইতে লাগিলেন।

এখানে ভজহরি বাবুর মহা ভজকট—এ রাত্রে কোথায়ই বা যাই, একে অসুস্থ শরীর, মাথার ব্যারাম উপস্থিত—তাহার উপর আজ কয়েক দিন অনাহার। আজ ঘরে যাই, দু এক দিনের মধ্যে সুবিধা করিয়া স্থানান্তরে নিশ্চয় যাইব। তখন সেই সংসার-তরীর গুণটানা মাজি ভজহরি বাবু গুটি গুটি গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং শুষ্কমুখে সুমুখীর কাছে উপস্থিত হইলেন। সুমুখী মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, গহনা আইসে নাই। তখন বলিলেন, আমার মরণই ভাল, মনুষ্যজন্ম জন্মে লোক-লৌকতা কিছুই হলোনা, পোড়া-পেটে কেবল খেলে কি হবে—সেখানে দশ বাড়ীর মেয়ে একত্র হয়েছে, আমি কেবল যেতে পারিলাম না—নেহাতই কাঙ্গালের ঘরের মেয়ে নইত, আমার মরণই ভাল। চুপ করে রহিলে কেন—গহনা এনে থাকত বল।

ভজহরি তখনও নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রী তখন একটু তর্জ্জন করিয়া বলিলেন "ওকি? চুপ করে থেকে কি হচ্চে? গহনা না এনে থাক, তাই বল,

বুঝি।” ভজহ র অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—আমাকে আর তুমি কিছু বলো না—কেবল ঐ চাকু ছুরী খানিকে আমার গলায় দাও, আমি সকল জ্বালা এড়াই।” স্ত্রী তখন গলা পঞ্চমে চড়াইয়াছিলেন; এককালে যেন পঞ্চাশ খানি কাঁসোর বাজিয়া উঠিল, বলিলেন—“আমি এখনি গলায় দড়ি দিয়া মরিব, ঐ ছুরী আগে আমার গলায় দিব—আমি মর্‌বো মর্‌বো মর্‌বো, এত অপমান লাঞ্ছনা—ধন্যি আমি, তাই এখন বেঁচে আছি—আমার অদৃষ্টে এই ছিল।” শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশিগণ ভাবিতে লাগিল, ভজহরির বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে নাকি? তখন ভজহরি অতি কাতর হইয়া জোড় হাতে বলিলেন—তুমি আমায় এ যাত্রা ক্ষমা কর, একটু আস্তে কথা কও, লোকে শুনিলে বলিবে কি?”—জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত উথলিয়া পড়িল। কাল-ভৈরবরূপিণী সুমুখী যেন জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভজহরি দ্রুতবেগে উৰ্দ্ধশ্বাসে বাটী হইতে পলায়ন করিলেন।

রমণীর মর্ম্মকথা।

সভ্য-পুরুষমণ্ডলীর মাঝে, একটা হাহাকার উঠিয়াছে, স্ত্রী-লোক বড় অলঙ্কার-প্রিয়। গহনার দেহি দেহি ডাকে পুরুষের কাণ গেল, মান গেল, প্রাণ গেল! যেন পাপিনী রমণী ভৈরবী সাজিয়া গহনার জন্য, ভাল-মানুষের ছেলের চক্ষে সদাই ত্রিশূল বিদ্ধ করিতেছে! অনেক পুরুষের বিশ্বাস, বুঝি রমণীকুলের এই পাপেই আকাশে জল নাই, গরুর বাঁটে দুধ নাই, গাছে আম নাই; বুঝি এই পাপেই ইলবার্ট-বিল পাশ হইল

না, লালমোহনের বিলাত যাওয়ার ফল ফলিল না, কলপে পাকা চুল কালো হইল না, পাউডারে শ্যাম অঙ্গ সুন্দর হইল না। এ অমঙ্গলের আকর নারীজাতিটা দেশ থেকে উঠিয়া না গেলে, দেশের আর শ্রেয়ঃ নাই।

রমণী চিরকালই পুরুষের দাসী; যেন স্বামীসেবা করিতে করিতেই সহধর্ম্মিণীর শরীর ক্ষয় হয়, যেন পতির চরণপ্রান্তে মাথা রাখিয়া স্ত্রী ইহসংসার ত্যাগ করে; ভগবান আমাদের অদৃষ্টে ইহাই করুন। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। তোমরা বলবান্ পুরুষ—রমণীর আশ্রয়—পঙ্কজের ভাস্কর—কুমুদিনীর চন্দ্র—তোমাদের কি ধর্ম্ম তা জানিনা। তবে এই মাত্র বুঝিয়াছি, স্ত্রীলোককে গালি দেওয়া তোমাদের একটা ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। এ নবধর্ম্ম তোমাদেরই বজায় থাক্, আমরা তাহার অংশভাগিনী হইতে চাহিনা, তবে পতিব্রতা সতীসাধ্বী গৃহিনীগণকে বৃথা গালি দিলে, গৃহের পাছে অমঙ্গল হয়, ইহাতেই অন্তর কাঁদিয়া উঠে।

আমরা গহনা চাই বটে, গহনার জন্য কখন কখন বিরক্তও করি বটে, কিন্তু সে গহনা লইয়া কি আমাদের স্বর্গদ্বারের সিড়ি প্রস্তুত হয়? পিতার ভরণ পোষণের জন্য তাহা কি বাপের বাড়ী পাঠাই? না;,নিজের সোণার চন্দ্রহার ভাঙ্গিয়া ভেয়ের গলার হার গড়াইয়া দি? যাহা দাও সবই ত তোমার থাকে?

আমরা কেবল ভাণ্ডারী; যত্ন করিয়া রাখি, ধূলা ঝাড়ি, বাক্স সাজাই; আর অসময়ে আবশ্যক হইলে তোমার ধন তোমাকেই দি। তবে অপরাধের মধ্যে আমরা·বিনা মাহিন

ভাণ্ডারী-কেবল্ চরণধূলার ভিখারী। আমরা বুঝি, গহনা পরিলে স্ত্রীলোক চতুর্ভুজ হয় না, রং ফরসা হয় না, শশধরলাঞ্ছন হয় না, গমন গজেন্দ্রকে লজ্জা দেয় না; আমরা বুঝি গহনা হলোয়ের বটিকা নহে যে, ইহাতে শরীরে সর্ব্বরোগ সভয়ে পলায়ন করিবে, গাজীপুরী গোলাপ জল নহে যে, মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে; বড়বাজারের রাতাবি সন্দেস নহে যে, সরস রসনা তৃপ্তি লাভ করিবে,—এত বুঝি, তবুও গহনা গহনা করি, কেন?—গহনা অসময়ের সম্পত্তি, দুর্ভিক্ষের অন্ন, দেন-ডিক্রীর নগদ টাকা; যখন তুমি কন্যাদায়গ্রস্ত, পণের টাকা জুটাইতে পার না, তখন কে গহনা বন্দক দিয়া টাকার সংকুলান করে? যখন ছেলেটীর ডিপজীটের টাকা অভাবে এণ্ট্রেন্স-পরীক্ষা দেওয়া হয় না, তখন কে পায়ের মল বাঁধা দিয়া দশটাকা ধার আনিয়া দেয়? তখন তোমার পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তুমি বলিয়াছিলে, "প্রিয়ে! পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে আমার মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না, আমার হাতে একটি পয়সা নাই,—কি উপায় করি বল দেখি?" তখন কে দ্বিরুক্তি না করিয়া অমনি হাতের কঙ্কণ, গলার সাতনর, কাঁকালের চন্দ্রহার খুলিয়া দিল? স্ত্রীলোক রাক্ষসী নহে যে, গহনা লইয়া গিলিয়া ফেলে, পরী নহে যে, গহনা লইয়া উড়িয়া পলায়;—তোমাদের প্রদত্ত ধন, তোমাদেরই থাকে,—তাহার জন্য এত গঞ্জনা, লাঞ্ছনা অবমাননা কেন?

আর একটা কথা বলি। একথা বলিবার নহে—মুখে আনিলে, হৃদয়ে ভাবিলেও পাপ আছে—তবে তোমরা নাকি দারুণ স্বার্থ-অন্ধ, চোখে আঙ্গুল দিয়া না বুঝাইলে বুঝনা, তাই

এ পাপিনীকে পাপ কথা পাপ মুখে বলিতে হইল,। বল দেখি, আমরা যে তোমার আজীবন দাসীগিরি করি, তাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি প্রিয়তম, নয়টার সময়ে আফিসে যাইবে, আমি প্রাতে উঠিয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত প্রস্তুত করিয়া দিলাম; তুমি বৈকালে আসিয়া জল খাইবে, আমি লুচি মোহনভোগ করিয়া রাখিলাম; তোমার একটু সর্দ্দি করিয়াছে, আমি সারানিশি জাগিয়া তোমার পদতলে ফোমেণ্ট করিলাম; তুমি শীতে নিশীতে গরম জল না হইলে আঁচাইতে পার না, আমি গরম জলের ঘটি হাতে করিয়া তোমার সম্মুখে ধরিলাম। বল দেখি, কে এমন শরীর রক্ষা করিয়া হৃদয় প্রাণ সঁপিয়া তোমার মন বুঝিয়া, আজীবন এরূপ দাসীগিরি করিতে পারে? এ দাসীর যদি দুই টাকা করিয়াও মাসিক মাহিনা ধর, তবে পঞ্চাশ বৎসরে মায় শুদ অন্তত দেড় হাজার টাকা হইবে। তাই বলিতে হয়, খান কতক গহনা দিয়া এত খোঁটা দাও কেন? দিতে পারিবেনা, অক্ষম—তাহাই স্বীকার কর;—স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, চুপ করিয়া থাক; দিব না—অথচ চক্ষু রাঙ্গাইব, পুরুষ জাতির ইহা কেমন নীতি—এ অধমা নারী, তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কিন্তু পুরুষ-সিংহের ঐ সুগভীর গর্জ্জন শুন—"কি বলিল নুনখায়িনী, অকৃতজ্ঞা,—আমার ঘরে থেকে আমার খেয়ে,—আমারই নিন্দা? রমণীর জন্য পুরুষ কত কষ্ট না সহিতেছে? প্রতি রবিবারে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে লেখা পড়া শেখায় কে? রমণীকুলের জ্ঞানোদয়ের জন্য চেষ্টা করে কে? বোধোদয় পড়াও বটে, কিন্তু কেন, স্বার্থ কীর? তুমি প্রাণপতি বিদেশে

থাকিবে আর আমি প্রত্যহ ডেলি নিউস চালাইব “হে প্রাণেশ্বর; হে প্রাণবল্লভ, হে জীবন-আকাশের এক মাত্র চাঁদ, হে হৃদয়-সমুদ্রের একমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা, হে পক্ষীর মধ্যে গরুড়, হে অট্টালিকার মধ্যে মনুমেণ্ট, হে রামসেনা মধ্যে অঞ্জনানন্দবর্দ্ধন! একবার অধিনীর উপর করুণ কটাক্ষপাত কর হে!”—তুমি বিদেশে বসিয়া এই সব পড়িয়া খুসী হইবে, আর মনে মনে বলিবে, “বাহবা কি বাহবা,—এমন শিক্ষিতা পতিব্রতা, কুরঙ্গ-নয়নী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই।” এই জন্যই ত বোধোদয় পড়াও—না আর কি আছে?

কোন কোন ভাবুক পুরুষ, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন; “হায় হায়! কি ছিল, কি হইল! রমণীকুলের দশা কেন এমন হইল? যাঁহারা গৃহদেবতা ছিলেন, তাঁহারা এখন অপ্সরা হইয়াছেন, কল্যাণী রঙ্গিনী হইয়াছেন, গৃহের স্তম্ভ, দেয়ালের পেণ্টিং হইয়াছেন, সহধর্ম্মিণী খ্যামটাওয়ালী হইয়াছেন। আমরাত মন্দই—চির অপরাধ-ময়ী! কিন্তু তোমরা কি ছিলে, কি হইয়াছ ভাব দেখি? সে সোণার সংসার আর নাই, এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—অধিক কি, পিতা পুত্র একত্র থাকিতে চাহে না- মাতা বাপের পরিবার হইয়াছে। তখন এক ভাই বিদেশে চাকুরি করিত অপর ভাই গৃহে চাসবাসে মন দিত, পিতা গৃহের ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিলেন। এরূপ একত্র এক অন্নে থাকিয়া ক্রিয়াকলাপ, দোল,দুর্গোৎসব, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, একটু অধিক সঞ্চয় হইলে অতিথিশালা স্থাপন বঙ্গীয় গৃহস্থ গৃহে এ সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইত। এখন যেন পক্ষীর জাত হইতেছে, ডানা বাহির হইলেই উড়িয়া পলাও, আর

বুলি ধর "আমি কার, কে আমার কারে ভাবিরে আপন।" তখন সুব্রাহ্মণ আনাইয়া কথকতা দিয়া গৃহ পবিত্র করিতে, আবলি বৃদ্ধ বনিতা, উচ্চ, নীচ, পণ্ডিত, মূর্খ সকলে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ ভরিয়া সে হরিগুণ গান, সে সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণ করিত; এখন সেই পবিত্র বঙ্গ-গৃহে বারবিলাসিনীর বিভৎস-নাচ না দেখিলে, খ্যামৃটেশ্বরীর "বসন্তে ফুট্‌লে কুসুম ফুল" গান না শুনিলে, তোমার তাপিত প্রাণ শীতল হয় না। তখন হৃদয়ভরা প্রেমে, বুক ভরা ভাবে, মুখভরা মধুময়ী কথায় সদা-লাপ করিতে,—বোধ হইত, বুঝি ইহাতেই স্বর্গ, বুঝি ইহাই মুক্তি, ইহাই বুঝি বক্ষের কৌস্তভ মণি, কণ্ঠের কহিনুর, নয়নের তারা, দেহের প্রাণবায়ু, আর এখন তোমাদের প্রেমের পরি-বর্ত্তে স্বার্থ, ভালবাসার পরিবর্ত্তে মনরাখা মিষ্টি ছুরী, সদালা-পের পরিবর্ত্তে খল খল হাসি;—তাই বুঝি এখন আর পত্নী-বিয়োগে অশৌচ কাল শেষ হইবার অপেক্ষা করিতে পার না,—দ্বিতীয় দিনে নূতন বেশে নূতন হাসি হাসিয়া নূতন ',কনে" দেখিতে যাও।

পুরুষ জাতির অধিক নিন্দা করিব না, এই মাত্র বলিব,—যিনি রামায়ণের রাম ছিলেন, তিনি এখন লণ্ডন রহস্যের যুবরাজ হইয়াছেন,—ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির, ননিচোরা কেঁদ্রেভাঙ্গা, কদম-তলায় কৃষ্ণ হইয়াছেন; ভগবৎগীতা বিদ্যাসুন্দর হইয়াছে; চন্দন-বৃক্ষ বাবলা গাছ হইয়াছে। তুমি আগে ছিলে, গঙ্গা জলে চিনি, এখন হইয়াছে ব্রাণ্ডিজলে লেমনেড; আগে ছিলে তানসানের সঙ্গীত, এখন হইয়াছ নিধুর টপ্পা; খাঁটি সোণা পিতল হইয়াছে—দেবতা দৈত্য হইয়াছে।

গদাধর-চরিত।

(আরম্ভ)

গদাধরের গ্রামে বড় পসার, পাড়ায় ভারি মান্য, ঘরে অতিশয় আদর। ছেলে ভাল হইলেই এই রকম ঘটে ; জিনিয়স-আগুণ কবে লুকান থাকে ? গদাধর যখন নবম বর্ষীয় বালক' তখন হইতেই রাজনীতির গূঢ় রস বুঝিতে আরম্ভ করেন,—যেন বালক ধ্রুব ঐশ্বরিক ভাবে তন্ময় হইলেন। বঙ্গীয় রাজনীতির তেজ বড় প্রবল, যেন মরা গঙ্গায় ভরা বান,-—গদাই আর মাকে, মানেন না, বাপের কথা শুনেন না' মাষ্টারবে চক্ষু রাঙ্গাইয়া উঠেন। লোকে ভাবিল, ছেলের ভারি ইস্পিরিট।

গদাধরের পল্লীগ্রামে বাস। বাপ নিরীহ মানুষ—চাসবাস করে, খায় দায় থাকে। গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল। গদাই দুই বার মাইনর পরীক্ষায় ফেল হইয়া বলিলেন, এ স্কুল কিছু নয়, মাষ্টার কিছু জানে না ; গ্রামে, গঙ্গার এপারে আর পড়িব না— সহরের স্কুলে না পড়িলে বিদ্যা হয় না, উন্নতি হয় না। বুড়ো বাপ কি করিবে ? সেকেলে মানুষ ; পুত্রের কথাতে বুঝিল, "হতেও পারে, সহরে না থাকিলে বড়লোক হয় না"। বৃদ্ধের পূর্ব্বসঞ্চিত যা ধন ছিল—শরীরের রক্ত জল করিয়া যে কিছু রোজগার করিয়াছিল, তাহাই খরচ করিয়া পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইল। পুত্র শুভ দিনে বাঁকা সীঁথি কাটিয়া, পালা পেড়ে কোচান ধুতি পরিয়া, আতরের গন্ধে ভুর হইয়া, বিদ্যা শিক্ষার্থ কলিকাতা যাত্রা করিলেন, মনে হইল যেন একটী মল্লিকা ফুলের তোড়া চলিয়া যাইতেছে ; যেন বর বিবাহ বাসরে অগ্রসর

হইতেছে, অথবা যেন ফরেষডাঙ্গার বাবু কার্ত্তিক-বাহন ছাড়িয়া পদাচরণ করিতেছেন। গদাধর অতি পরিপক্ক বয়-সেই স্বগ্রামে হইতে প্রায় সকল নব প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মনোনীত হইয়াছিলেন; আর "একটা ছাগলের তিনটা লেজ," "বিড়ালে মহিষ প্রবল করিয়াছে"—এইরূপ অদ্ভুত সংবাদ লিখিয়া সংবাদপত্রকে এবং জগৎকে উপকৃত করিতেন। এখন সহরে আসিয়া সংবাদপত্র ছাড়িয়া মেগাজিন ধরিলেন। কারণ গদাই সতত বলিতেন, সামান্য বিষয় আর তাঁহার কলমে আইসে না—তাঁহার মস্তিষ্ক কেমন খারাপ হইয়াছে যে, ছোট বিষয়ে আর তাঁহার নজর পড়ে না, কাযেই তাঁহাকে ম্যাগেজিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সে যা হোক, এ দিকে আবার পোড়া শিক্ষকের দোষে, পাপ স্কুলের দোষে গদাই সহরেও পুনঃ পুনঃ এণ্টেন্সে ফেল হইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত তেজ কিছুতেই কমে না, বাপকে লিখিলেন, প্রিয় পিতঃ পাস ফেল কেবল হাওয়ার গতি—ইহাতে বিদ্যার কিছুমাত্র পরিমাণ বুঝা যায় না—পিতঃ আমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ইহকাল পরকালে পরম সুখে বাবুগিরি করিয়া কাল কাটাইতে পারিব।

ক্রমে বড় কঠিন কাল আসিল। পিতার ধুলি গুঁড়ি চক্রাকার হইল,—ছেলেকে আর বাসাখরচ পাঠাইতে পারিলেন না। গদাই তখন সংসার আঁধার দেখিলেন; অন্ন চিন্তা চমৎকার হইল। আশা বৃহৎ—ডেপুটীগিরির কম চাকুরী লইবেন না, এইরূপ আড়ম্বর করিতেন। কিন্তু ক্রমে বুঝিলেন, আম কোন্ কীটাণুকীট

—যেখানে বড় বড় ইন্দ্রপাত হইতেছে, সেস্থলে গদাইয়ের গলা-ধাক্কা ব্যতীত অপর পুরস্কার কি হইবে? সকল আশা ভরসা "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" হইল; গদাই ক্রমে শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কি করি? কিন্তু জিনিয়স-গদাইয়ের অধিক্ষণ ভাবিতে হইল না—""সংবাদপত্রের এডিটর হই, কিম্বা দেশহিতৈষী হই" এই দুইটীর মধ্যে কোন্ পদটী গ্রহণ করিবেন, তাহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেশ-হিতৈষিতার প্রধান অস্ত্র বক্তৃতা, তাহাতে গদাই কর্ম্ম নহেন, তবে বক্তৃতায় ত পয়সা হয় না—এই ভাবনায় অস্থির হইলেন; কিন্তু তখনই প্রতিভা বলে বুঝিলেন, বুদ্ধি থাকিলে কি না হয়? বুদ্ধি থাকিলে সাগরে তরী চলে, আকাশে বেলুন উঠে, জলে পদ্ম ফুটে, দুধে গোয়ালা জল ঢালে, চোরে চুরী করে। আমি এত লেখা পড়া শিখিয়া কি কেবল শুধু হাতে ফিরিব? গদাধর সেই দিন হইতে দেশভক্ত হইলেন, মুখে আর কোন কথা নাই, কেবল বলিতেছেন।

> মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি;
> রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি!
> সত্বরে কামস্কট্‌কা রেলপথ করি,
> ভাসিব আনন্দে ভারতে উদ্ধারি।

---

(২)

গদাধরের মনে মনে ধারণা, তিনি বড় সুপুরুষ। ভাবিতেন এমন সুন্দর রঙ আর কোথাও নাই; হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, মিত্রদের বড় বাবু অপেক্ষা তিনি চারি গুণ ফরশা, ঘোষেদের

মেজ বউ অপেক্ষা সাড়ে তিন গুণ এবং ঠাকুর বাড়ীর রঙ অপেক্ষা দ্বিগুণ—রঙে ইহ জগতে দ্বিগুণের নীচে তিনি কখনও হইলেন না। গদাইয়ের ইহসংসারে একটা বিশেষ কার্য্য দর্পণে মুখ দেখা। সময় নাই, অসময় নাই, সুবিধা পাইলেই আয়না লইয়া অমনি মুখ দেখিতেছেন—সম্মুখে আয়না খানি রাখিয়া কখন চোক বুজিতেছেন, কখন দাঁত বাহির করিতেছেন, কখন বা রুমাল দিয়া চোখের কোণ্ মুছিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, আমিই বুঝি স্বয়ং রতিপতি কন্দর্প—ভুলক্রমে মানবগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

গদাই কেন যে এমন করিতেন, তাহা তিনিই জানেন, তাঁর মন জানে, আর অন্তর্যামি-ভগবানই জানেন; লোকে কিন্তু চর্ম্মচক্ষে দেখিত, গদাই একটী মেটে রঙের পুরুষ, চোক দুটি কোটরে, লম্বা—গায়ে মাংস নাই। তবে লোকের ভ্রান্ত চক্ষু দূষিত হইতে পারে।

গদাই একটী নিখুত পুরুষ; গম্ভীর, ন্যায়ের মস্তকে কখন পদাঘাত করেন না, সুরাপায়ী দেখিলে শিহরিয়া উঠেন, লোকের দুঃখ দেখিলে কাঁদেন। তবে যদি কেহ বলিত "গদাই! তোমার বয়স ৩২ বৎসর—তুমি কি আজকের লোক?" গদাই অমনি ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইতেন,—বলিতেন, আমার অপেক্ষা রামহরি দশ বৎসরের বড়, তার আজও বিবাহ হইল না। তোমরা বড় খারাপ লোক। বয়স লইয়া লোকের সহিত গদাইয়ের সচারাচর বচসা হইত। গদাইকে অশ্রাব্য কটূক্তি কর, দুই ঘা মার—শিষ্ট শান্ত গদাই সকলই নীরবে সহিতে পারেন, কিন্তু কুড়ির বেশী বয়স বলিলে গদাই ক্ষুধিত

সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেন। ঈশ্বরের কেমন সৃষ্টি জানি না, কিন্তু গদাই-চরিত্র এই রূপই ছিল।

এক দিন প্রাতঃকালে সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া গদাই নিবিষ্ট-চিত্তে কি গভীর ভাব ভাবিতেছেন, তাহা কেহ জানে না; মলয় মারুত-আন্দোলিত নলিনীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে দুলিতেছেন, আর অস্ফুট কণ্ঠস্বরে, বলিতেছেন, "সব ঠিক্, কেবল চীনে একজন দূত পাঠাইলেই হয়—উপযুক্ত পাত্র কে? পাত্রের মধ্যে ত আমি আর মিষ্টার গোবর্দ্ধন। কিন্তু আমরা গেলে চলে কৈ? তবে কি কামস্কট্‌কা রেল পথ হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে?" গদাই ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ভাব সাগরে ডুবিয়া গেলেন; ক্রমে একটু উঁচু স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

একা আমি এসংসারে কোন্ দিক্ রাখি,
দুই হাত দুই পদ, দুই নাস পুট—
দুটীর অধিক মোর নাহি কর্ণ ছিদ্র;
হায়রে নাহিক জিহ্বা একের অধিক,—
সামান্য সম্বলে বল কেমনে পথিব
কামস্কটকা-ভূমি; হায় মোর কি যন্ত্রণা;
কেন না হইল মোর দুইটী রসনা,
চারি চক্ষু চারি হস্ত, চারিটি চরণ।
তা হলে কি আজ আমি ভাবিতাম এত?
দুই চোক পাঠাইতাম চীন উপকূলে,
একটি রসনা যেত লয়ে দুটী হস্ত
(বক্তৃতাকালে নাড়িবার হেতু চীন দেশে)
এতক্ষণ চীনরাজ কাঁপিত সভয়ে—

পায়ে ধরি ভাব করি দিত ভূমি ছাড়ি ;
চলিত বাষ্পীয় যান গভীর গর্জ্জনে
ঘোর রবে ঘর্ঘরিয়া ঘুরিয়া উঠিত
গিরিশৃঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে মাতঙ্গ যেমতি
ধায় মাতঙ্গিনী পিছে পর্ব্বত উপরি।
কিন্তু একা আমি ; যোড়া যোড়া নাই বন্ধু
কি করিতে পারি ? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অশি করি করে উপাড়িয়া ডান চক্ষু,
চিরিয়া রসনা, ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু
ফেলি চৈনিক প্রাচীরে,

এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরিল ; গদাই বলিলেন,

" কে তুমি হে ? মিষ্টার মিত্রজ নাকি ?
চক্ষু চাপি কিবা ফল ছাড় দুনয়ন ;—
জ্ঞান-চক্ষে ধূলি দেয় কাহার শকতি ?
পার্থিব-নয়ন ঢাকি মোরে কি ভুলাবে ?
চক্ষু বুজি সব দেখি, আমি গদাধর !

তখনও তিনি চক্ষু ছাড়িলেন না—গদাই আবার বলিলেন,—

চক্ষু ছাড় গোবর্দ্ধন মিত্রজ নন্দন
নয়ন-রতন আজি বড় মূল্যবান ;
ডান চক্ষু যাবে আজ চীনের মুল্লুকে,
বাম আঁখি রবে গৃহে, গৃহ, করি আলো।

সেই লোকটি তখন চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল ; গদাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন ; একি ?

নিবাস কোথায় তব ঘর কোন্ দেশে ?
কভু তুমি নহ বঙ্গে মিষ্টর গোবর ?
বঙ্গ ভূমি জন্ম-ভূমি নহেরে তোমার ?
'জাতীয় লক্ষণ নাই তোমার শরীরে !
হ্যাট, কোট কৈ তব ? গলায় কলার কৈ ;
একি বস্ত্র পরিধান ?—সাজে মরি দেখে
ফিঙ ফিঙে কাপি—নীচে তার কাল ডোরা,
উপরে উলঙ্গ অঙ্গ—রঙ্গ ভঙ্গ দেখি
শিহরে আতঙ্কে অঙ্গ মোরে ; হায় বিধি
কি মাটীতে গড়েছিলে এ নর-মূরতি ?

লোকটির নাম হরিদাস ঘোষ, গদাধরের গ্রামবাসী। বাল্য কালে উভয়ে গ্রাম্য স্কুলে পড়েন। তবে পরস্পরে এক্ষণে পদের তারতম্য হইয়াছে, হরিদাস ১০৲ টাকা মাহিনার কেরাণী, গদাধর এখন উচ্চে,—গিরি শৃঙ্গ অপেক্ষা অধিক উন্নতস্থলে—প্রায় স্বর্গের কোলে অবস্থিত। একথায় ছাপা-খানা করিব বলিয়া গাদাই হরিদাস বাবুর নিকট হইতে তিন শত টাকা কর্জ্জ করেন ; লোকে বলে সে টাকা মতিলাল সাহা ডিক্রী জারি করিয়া লয়, গদাই বলেন, "কামস্কট্কা রেল-পথে ব্যয় হইয়াছে।" সে প্রায় এক বৎসরের কথা। হরিদাস মাসে এক খানি পত্র লিখিয়াও সে টাকা পান নাই—ভাল মানুষ হরিদাস কি করেন, শেষে স্বয়ং আসিয়া দেখা করি-লেন ! তিনি বড় আমোদপ্রিয় লোক। বহু দিনের পর বালক-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরেন ; শেষে গদাইয়ের বিকৃত ভাব দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত

হইয়া চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে হরিদাস বলিলেন, "ভাই গদাই একি ? তোমার কি হইয়াছে ? আমাকে কি সত্য সত্যই চিনিতে পারিতেছ না ? তুমি বিকৃত ভাষায় ও সব কি বলিতেছ ?"

উত্তরিল, গদাধর, ক্রোধে কম্প দেহ—
'কে তুমি হে কৃষ্ণকায় ? ভোমরা ভরম
হয় দেখি তব দেহ ; কুকণ্ঠে উগার
কেন কাল পেঁচা সম কিচিকিচে ধ্বনি ;
(এবে) অনেক সাঙ্গাত আসে সখা সখা বলি
আলাপিতে মোর সনে এ ঐশ্বর্য্য-কালে।
ভাই বল খুড়া বল, বাবাইবা বল—
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয় !
অধিক কি আর কথা আছে তোমা সনে।
শীঘ্র ছাড় মোর পাশ—বমি বাহিরিবে
দেখি তব কালো অঙ্গ ; চামচিকা সম
দুর্গন্ধ গায়েতে তব—পালাও অসভ্য
নহিলে পুলিশে দিয়া প্রহারিব তোরে।"

হরিদাস বাবুর একে অনেক দিনের পাওনা আছে—তাহার উপর এইরূপ ব্যবহার, তিনি একটু জ্বলিয়া উঠিলেন—"দেখ গদাই তোমার আদি অন্ত নাড়ী নক্ষত্র জানিতে আমার আর কিছু বাকি নাই, টাকা ধার লইয়াছ, দাও ; যারা তোমাকে জানেনা, তাহাদের নিকট বক্তৃতা করিও, চক্ষু বুজিও—কামস্কট্‌কায় রেল-পথ পাতিও। আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না ? আমাকে তোমার স্মরণ না থাকিতে পারে,—

কিন্তু যে দিন রামমণি ময়রাণীর মোকদ্দমায় তোমাকে পুলিশে লইয়া যায়, সে দিন তোমাকে কে রক্ষা করিয়াছিল? যখন খাইতে পাইতে না, প্রত্যহ এক বেলা অন্ন জুটিত না; তখন কে টাকা দিয়াছিল? যখন দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের টাকা উদরসাৎ করিলে, সে সময়ে তোমাকে কে বাঁচাইয়াছিল? এ সকল কথাও কি এখন মনে নাই? এখন তুমি বড় লোক হইয়াছ, সাহেব সাজিয়া থাক, কবিতা রচনা কর,—বড় লাটের লেভিতে যাও, বক্তৃতা দাও,—শেষে কামস্কট্‌কায় রেল পাতিতেছ,—আমাকে চিনিবে কেন? আমি কালো, অসভ্য, সন্দেহ নাই,—তবে যে তিন শত টাকা ছাপাখানা করিব বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলে, তাহা দিলেই ঘর যাই।

গদাই। শুন বন্ধু নিবেদন—ক্রোধ কর কেন?
মন মোর মজিয়াছে ভারতের ভাবে
ভাই, বন্ধু, মাতা, পিতা মনে নাহি পড়ে,
মুখ দেখি আর কারো চিনিতে না পারি
তুমি হে পরমাত্মীয় বৈস মোর কাছে
ভাল কর্ম্ম দিব ভাই! কামস্কট্‌কার পথে।

হরিদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ভণ্ডামি রাখ; সোজা কথা কও নহিলে আমি চলিলাম।" গদাই তখন হরিদাসকে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া গিয়া গোপনে কি বলিলেন।

তখন হরিদাস গদাইয়ের দলে ভর্ত্তি হইতে অনুরুদ্ধ হইলেন। হরিদাস বলিলেন, আমি খেতে না পাই তাও স্বীকার, তোমাদের সঙ্গে মিশিব না। এই কথা বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইলেন।

ছোক্‌রা বাবু।

ছোক্‌রাটী দশকর্ম্মান্বিত। সব জানেন, সব বুঝেন, সবেতেই আছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, রাজনীতি, পবিত্র প্রণয়, পরোপকার—এ সমস্তই তাঁর একচেটে। যেমন ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন, গানবাজনাতেও তিনি সেইরূপ. গৃহস্থের খোলা উঠান দেখিলেই, তিনি ঠিক আঁচিয়া লয়েন—এখানে বক্তৃতা জমিবে কি না, এখানে পাঁচ শত লোকের সমাবেশ হয় কি না, এখানে রমণীকুল চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাইবেন কি না? গোল দীঘি, লাল দীঘি, হেদো, বিডন উদ্যান, জলের কলের মাঠ—তাঁহার কণ্ঠধ্বনিতে বহুবার প্রতিধ্বনিত। এদিকে ত এই; ওদিকে ঝিঁঝিঁট, খাম্বাজ, বসন্তবাহার, ললিতবিভাস, ইমন, পুরুবি—প্রায় সমস্ত সুরই তিনিই ভাজিতে পারেন। লোকে ভাবে কালেজের এত পড়া পড়ে, ছোক্‌রা বাবু এত গান শিখিলেন কেমন করে? হারমোনিয়মেও তাঁর দখল কম নহে। পাড়ার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটী অতি শিশু বালিকাকে তিনি মধ্যে দিনকতক হারমোনিয়ম শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বাজনাবিদ্যার উৎকৃষ্ট পরিচয়। ছবি আঁকা, উলবোনা, ফুল-তোলা,—এসবেও তিনি পেছপাও নন। ধরাধামে এমন কোন কায দেখি না যাহাতে তিনি অগ্রগামী নহেন। সভায় স্থির হইল, অদ্য হইতে বালকগণের ধূমপান ও পান খাওয়া নিষেধ। শপথ-পত্রে তিনি সর্ব্বাগ্রে সই করিলেন। শিমলা পাহাড়

হইতে রীপণ হাবড়া ষ্টেশনে নামিলেন, তিনি রীপণের সম্মুখে সর্ব্ব প্রথমে দণ্ডায়মান। ধ্বজা ধরিয়া ভারত উদ্ধারের জন্য চাঁদা তুলিবার দরকার, তিনি কোমরে চাদর জড়াইয়া, চাঁদার খাতা বগলে করিয়া অলিগলি ঘুরিতেছেন। আর, এই বয়সে ছোক্‌রার প্রেম-বিষয়িণী অভিজ্ঞতারই বা দৌড় কত! হৃদয়টা গলেই আছে! প্রাণ-পাখীত উড়েই আছে! মানস-সরোবরে পদ্মফুলত ফুটেই আছে। আড় নয়নে চাহনিত অনবরত বাঁকাই আছে! গোধূলি লগ্নে ছাদে উঠিয়া একদৃষ্টে তীর্থদর্শন ত আছেই আছে! এক জন বন্ধু একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসেন, "ওহে ভাই! তুমি এ ভর্‌সন্ধ্যা বেলা, চোখ কপালে তুলে, রোজ রোজ একদৃষ্টে ঠায় কি চেয়ে দেয় বল দেখি? চোখ ক্ষরে যাবে যে!" ছোক্‌রাবাবু তখন এক মহা বিকট ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন "কি কহিলে, অবোধ! আমি আকাশ-পটে অঙ্কিত জ্যোতিষিক পদার্থ দেখিতেছি; গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্যের অস্ত-গমন, চন্দ্রের প্রস্ফুটন, নক্ষত্ররাজির সুশোভন অনিমিষ লোচনে হেরিতেছি,—

হে নভোমণ্ডল বল স্বরূপ;
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ?

জ্যোতিষজ্ঞানের জন্য চক্ষু ক্ষরে, ক্ষরুক। রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য ভগবতীকে চোখ উপড়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন, আর আমি এ সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য, জ্যোতিষের উদ্ধারের জন্য, আমার দুইটী চক্ষুই কি দিতে পারিব না?"

বন্ধু! আকাশের শোভা দেখ্‌তে হলে, চোখ ত উপর পানেই থাকে। তোমার টেড়্‌চা চোখ বাঁকা-রেখায় নীচে পানে

ঠায় চেয়ে আছে কেন? জ্যোতিষ কি ছাদের উপর? চন্দ্র সূর্য্য কি জানালায় উঠে?

ছোক্‌রা। ছি! তুমি বিজ্ঞান বুঝনা!—তোমার শিখিতে এখনও ঢের বাকি। তোমার সঙ্গে আমি কথা কহিতে চাহি না।

তার পর হইতে ছোক্‌রা বাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইল।

ছোক্‌রা বাবু সর্ব্ব গুণের গুণমণি,—কেবল "এল এ" ফেল। বিগত বৎসর এলে ফেল হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস-বাসনায় গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। কেহ বলিল, ডিরেক্টারের চাকুরি যাইবে; কে ভাবিল, পরীক্ষক প্রাণে মরিবে; কেহ বুঝিল, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ দীপান্তরিত হইবে।—ক্যোশ্চেন পেপার "কল্" করিয়া তিনি মহা মহা মেমোরিয়াল ড্রপ্ করিতে লাগিলেন। প্রথমে ছোট লাট, তার পর বড় লাটের কাছে দরখাস্ত গেল। তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তিনি বিলাতে জন্ ব্রাইটের নিকট সে আবেদন পঠাইয়া দিলেন। এমন কি, এ বিষয়ে লড়িবার জন্য, বিলাতে শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকেও মোক্তারনামা দিবার কথা হয়। সেই আন্দোলনে পৃথিবী ভূকম্পের ন্যায় টল্ টল্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছোক্‌রা বাবু বলিতে লাগিলেন; ইংরাজী সাহিত্যে আমার ৯৯ নম্বর নিশ্চয়ই পাইবার কথা,—সেই সাহিত্যেই আমাকে ফেল করিয়াছে; সাহিত্য আমার কেল্লা—সে কেল্লা দখল করে কে? নিশ্চয়ই আমার কাগজে নম্বর দিতে ভুলিয়াছে, প্রথমে নির্জ্জনে এরূপ চিন্তা, চিন্তার পর সখাগণ সমক্ষে

ঐরূপ কথাবার্ত্তা, অবশেষে ঐ বিষয়ে টাউনহলে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য বক্তৃতা! দেখিয়া শুনিয়া ছোকরাবাবুর গুরুজী বলিলেন, "এই ছোকরা, কালে অদ্বিতীয় পুরুষ হইবে—ভবিষ্যতে আমার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে।"

এল, এ, ফেল হইয়া আন্দোলনের পরই ছোকরাটী নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়াই অবধি প্রণয়-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। কনেটীত নয় বৎসরের বালিকা, এখনও ধূলাখেলা করে, দিনে তিনবার ভাত খায়; তাহাকেই, বিবাহের এক সপ্তাহ পরে, তিনি এইরূপ পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন;—

"প্রাণপ্রতিমে,

তোমার অদর্শনে প্রাণ জ্বলি জ্বলি করিতেছে। বিচ্ছেদের আগুণ দাউ দাউ জ্বলিতেছে। তোমার সেই মুখখানি,—সেই পূর্ণিমার শশধরবিনিন্দিত সেই প্রেমপূর্ণ মুখখানি—আমি কেমন করিয়া ভুলিব? ইচ্ছা হয়, ব্যোমযানে করিয়া উড়িয়া গিয়া তোমায় একবার দেখিয়া আসি, তোমার সেই আধ হাসি, আধ-লজ্জাপূর্ণ বদনমণ্ডলে একটী পবিত্র চুম্বন রাখিয়া আসি, কিন্তু বুঝি বিধাতার সেরূপ অভিপ্রায় নহে, নহিলে তুমি এত দূরদেশে থাকিবে কেন? তবে প্রাণেশ্বরি! ইহাও জানিও, যে যার প্রিয়, সে তাহার কখনই দূর নহে। আকাশের চাঁদ কোটী যোজন দূরে থাকিয়াও, হ্রদমধ্যস্থ কুমুদিনীর বন্ধু। সাত সমুদ্র তেরনদী দূরে থাকিয়াও ব্রাইট্ ভারতমাতার বন্ধু! হা প্রাণনায়িকে! শারদিন্দুনিভাননে! তুমি আমার দূর নও!—সমুখে বসিয়া সেইরূপ ভাবেই আমার হৃদয় মন পুলকিত

করিতেছ! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি, আমি চুম্বন করিলাম! কিন্তু প্রিয়ধন! তুমি কৈ? তুমি লুকাইলে কেন? আমি চারিদিক্ আঁধার দেখিতেছি!

প্রাণপ্রেয়সি! গোলাপ নাম তোমাতেই যথার্থ খাটিয়াছে। কেমন গাল-ভরা নরম নাম! একবার নাম উচ্চারণ করিলেই মুখে রস আসে। ইচ্ছা হয়, নিভৃতে বসিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, একান্তমনে কেবল গোলাপ, গোলাপ, গোলাপ নাম জপ করি; —শেষে ঐ নামের সঙ্গে আমার পরমাত্মাকে মাথাচোথা করিয়া মিশাইয়া দি।

ফুলশয্যার রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কও নাই বটে, কিন্তু তখন একটি আধটা যে কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছিল, উষ্ণ মস্তিষ্কে বরফ-জল পড়িয়াছিল! আহা! সে কোমল কণ্ঠের কমনীয় ধ্বনি কিবা মনোহর,—ঠিক যেন বসন্তবাহার রাগিণীর রসময় সঙ্গীত, কি বলিব, প্রাণপ্রিয়ে! প্রাণ যে পুড়ে গেল! আমি চাতক-পক্ষীর ন্যায় আশা-বারির আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। তুমি কি একখানি পত্র লিখিয়া আমার এ আগুণ নিবাইবে না? আমাকে প্রতিদিন পত্র লিখিবে বলিয়া বিরানব্বই খানি টিকিট-যুক্ত খাম এবং এক প্যাকেট ডাকের কাগজ পাঠাইলাম। খামে আমার ঠিকানা লিখিয়া দিলাম, তোমার কোমল হাতের কষ্ট করিয়া আর ঠিকানা লিখিতে হইবে না। অদ্য বিদায়! চলিলাম।

মনে-রেখো ভুল না—

তোমারই শ্রীঅনঙ্গমোহন।

এই পত্র পাইয়া, সেই নয় বৎসরের কনেটী ভাল মন্দ কিছুই বুঝিল না;—কেবল ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিল! ছোক্‌রা বাবু ওদিকে নববিবাহিতা সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যহ পত্র লিখিতেন—ডেলিনিউস্ চালাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, এদিকে কনেটী ডেলিনিউসের কথা তিলার্দ্ধও মনোযোগ না করিয়া প্রত্যহ কেবল আপন মনে পুতুল খেলা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ছোক্‌রা বাবুর প্রাণ বড়ই আন্‌চান্ করিতে লাগিল,—ডেলিনিউসের বদলে, প্রাণাধিকার একখানি সাপ্তাহিক পত্রও পাইলেন না। ছোক্‌রা বাবু আবার স্ত্রীকে পত্র লিখিবার জন্য লেখনী ধরিলেন; আমরা অদ্য আপাততঃ কলম ছাড়িয়া বিদায় লইলাম।

হঠাৎ বাবু।

১ম।

দেখিতে দেখিতে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হইল। হাতে কলমে, জিহ্বার সাহায্যে—সৎ অসৎ কর্ম্ম করিয়া, ভাল মানষি জুয়াচুরি করিয়া অনেক টাকা রোজগার হইল। বাল্যকালের কেবলা নাম ঘুচিল ক্যাবলচন্দ্র বাবু নাম হইল। ধনের মাহাত্ম্য, ব্যবহারের মাহাত্ম্য, দুষ্কর্ম্মের মাহাত্ম্য—যখন এই তিন মহা মাহাত্ম্য—ত্র্যহস্পর্শে একত্র হইয়াছে, তখন তাঁহাকে পাড়ার মধ্যে, নগরের মধ্যে কেনই বা না প্রকৃত "বাবু" অভিধানে অলঙ্কৃত করা হইবে?

একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধ "ভট্টাচার্য্য" লোক জনের সাক্ষাতে প্রায়ই বলিয়া বেড়ান—"নির্ধনের" ধন হইলে, সে প্রায়ই

ধরাকে সরাখানা দেখে,—কিন্তু আমাদের হরিদাস তাঁহার পৌত্র (অর্থাৎ আমাদের নায়ক) আজি কালি ধরাকে কটরা খানি অপেক্ষাও ছোট দেখিতেছেন। ওর বাপ দূর হইতে দেখিলে দৌড়িয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লয়; ও ছোঁড়া এখন চোখোচোখি হইলেও কথা কয় না, গাড়ি করে বুক ফুলিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখিতে পাইলে আবার কটমট্ করে চেয়ে থাকা হয়।"

আর একজন বলেন, "শুধু কথা না কহিলে কোন ক্ষতি ছিল না, আজ কাল,উঁনি আবার মহা কুলীন হইয়াছেন। কুল-গৌরব করা হয়,বলা হয়,এমন নিখুঁত প্রসিদ্ধ কুল কোথায় মিলিবে না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলেন,—"ওর সমস্ত দোষকে পারা যায়—কেবল ব্যবহার দোষেই লোকটা মাটি হইয়াছে। ওর প্রপিতামহ ছিল মুটের সর্দ্দার, পিতামহ ছিল গোমস্তা, বাপ ছিল ৩০৲ টাকা মাহিয়ানার কলম-টানা কেরাণি, তার ছেলে আজ মানুষকে মানুষ বলে না কেন? এত নবাব, এত ধিঙ্গি হইল কেন? টাকা হইলেই কি সকলকে রূঢ় কথা, কটু কথা কহিতে হয়?—এক দিন সেই মূঢ়, একজন ভদ্রসন্তানকে এরূপ অপমানের কথা বলিল যে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। আমি হ'লে তৎক্ষণাৎ ক্যাবলচন্দ্রের দুই গালে চারি চড় মারিতাম।" এই কথা শুনিয়া অপর একজন উত্তর করিল, "বোধ হয়, মদের ঝোঁকে এরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবে—ক্যাবল ত লোক বড় মন্দ নয়।" তিনি ও রসে বঞ্চিত; বড় বাজে খরচ করেন না; তবে পরের পয়সা পাইলে কালে ভদ্রে একটু আধটু মদ খাওয়া আছে।

এসব কথা শুনিয়া একজন ধীর প্রকৃতি পুরুষ সর্ব্বদাই বলেন, "যাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ কখন সৎশিক্ষা পায় নাই, তাহাদের বংশধর কি এক পুরুষেই টাকা হইয়াছে বলিয়া সৎ ব্যবহার শিখিবে? ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? ভাল শিক্ষা পাইলে, ক্যাবলচন্দ্রের পুত্রগণ না হউক,—পৌত্র প্রপৌত্রগণ সম্ভবতঃ কখনই এরূপ ক্ষুদ্রচেতা হইবে না; এবং তাহাদের নজরও এত ছোট হইবে না।" কিন্তু এরূপ দূর আশায় কেহই বড় আশ্বাসান্বিত হইতেন না।

লোকে পরশ্রীকাতর বলিয়াই হউক, অথবা ক্যাবল বাবুর প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ আছে বলিয়াই হউক, যে কারণেই হউক—অনেকেই ক্যাবলের নিন্দাবাদ করেন; এবং অনেকেই তাঁহার অশিষ্ট আচরণে মনের দুঃখে কাল যাপন করেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত, যন্ত্রণায় অধিক অস্থির—ক্যাবলচন্দ্রের পিতা। বাপ বেটা বুড়ো' কালো, মাসে ১৫ টাকা পেন্‌সন পায় সকলের উপযুক্ত মান খাতির রাখে, সাদাসিধে লোক—মান, অভিমান খল কপট বড় একটা নাই। নানা কারণে শ্রীযুক্ত ক্যাবলরাম বাবু নিজ নিজ পিতার উপর অতিশয় বেজার হইয়াছেন; নানা কারণে জনক, পুত্রের চক্ষুশূল হইয়াছেন।

বাপ্ কালো কেন? দশাননজনক যদি ভ্রমরের ন্যায়, পরিপক্ক জম্বুফলের ন্যায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে ক্যাবলচন্দ্র বাবুর রঙ কখনই এত কালো হইত না। এক মাত্র পিতার দোষেই, পুত্রের সমস্ত সাবান্ মাখা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। লক্ষপতি হইলেন, গাড়ি ঘোড়া চাপিলেন, ইংরেজের বুট-পদ-রজ লইয়া উত্তমাঙ্গে রাখিলেন, অথাচ পৈতৃক অপরাধে, দুধে আলতার

মত রঙ ফলাইতে পারিলেন না; সুতরাং পিতা যখন পুত্রের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেন, পুত্র তখন রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিয়া পিতার মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন এবং আপনাপনি মনে মনে বলিতেন;—রে মূর্খ পিতঃ! তোমার বর্ণ দগ্ধ অঙ্গারের ন্যায় এরূপ কৃষ্ণ বর্ণ কেন? তোমার নিমিত্তই, প্রতিদিন শতবার বিধৌত হইলেও আমার এ দেহের মলিনত্ব ঘুচিতেছে না; আমি বলিতেছি এই পাপে তোমার সদ্গতি লাভ হইবে না।”

পিতার দ্বিতীয় দোষ, পুত্রের কথার বশ নহে; পুত্রের সহিত সমান উত্তর করেন। বাপ বেটা বড় বেয়াড়া লোক;—প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নানটী করা আছে, ইহা দেখিয়া ক্যাবল বাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইত; ক্যাবলরাম মনে মনে ভাবিতেন— তেল মাখিয়া গমছা কাঁধে করিয়া হাঁটিয়া স্নান করিতে যাওয়া ছোট লোকের কায; উপযুক্ত পুত্রের ধারণা ছিল—ইহাতে জনসমাজে কেবল তাঁহার অপমান হয়; বিশেষ সেরূপ অবস্থায় রাস্তার মধ্যে পিতাকে বাপ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, সুতরাং গাড়ি করিয়া স্নান করিতে যাইতে বৃদ্ধের প্রতি হুকুম হইল; বৃদ্ধ সে কথা গ্রাহ্য করিল না; কাযেই পিতা পুত্রের চক্ষুশূল হইলেন।

গঙ্গাতীরে একটী হাট আছে, বৃদ্ধ আবার হাট বারে নিজের ইচ্ছামত বাজার করিয়া জিনিস পত্র গামছায় বান্ধিয়া লইয়া আইসে। পুত্রের ভয়ে অতি গোপনে এ কায সম্পন্ন করিতে হয়; কিছুদিন পরে গোয়েন্দাগণ পুত্রের নিকট সংবাদ দিল, বৃদ্ধ এই দুষ্কর্ম্ম করে। তখন ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না—

হুতাশন হুহু জ্বলিয়া উঠিল; হর কোপানলে মদন ভস্মের ন্যায়, পুত্র-কোপানলে পিতা ভস্ম হইবার ত উপক্রম হইল। অনুনয় বিনয়ে স্তব স্তুতিতে ক্রোধের বেগ সম্পূর্ণরূপে থামিল না। যে দিন অনল পিতৃ অঙ্গ স্পর্শ করিল, সেই দিন অবধি পিতার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইল—সদর বাটীর সরহদ্দ লঙ্ঘন করিতেও নিষেধ হইল, পিতা নজর বন্দিতে রহিলেন—হতভাগ্যের ইহ-জন্মের সমস্ত সুখ ফুরাইল; প্রাণ ধারণার্থ দুবেলা চারিটি চারিটি অন্ন পাইয়া নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বাস করেন—হুকুম ব্যতীত চৌকাট ডিঙ্গাইবার সাধ্য কি?—কেননা,—

"দ্বারে ফেরে দৌবারিক ভীষণ মূরতি।" সুপুত্র ক্যাবলচন্দ্র বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয় আপনার পিতাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?" ক্যাবলরাম উত্তর দেন, "তাঁহার মেজাজ খারাপ হইয়াছে,—উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, কবিরাজের চিকিৎসা হইতেছে, এখন আবার বাহির হওয়া নিষিদ্ধ।" সুতরাং বলিতে হয়, ক্যাবল বাবু ধনবান্ হওয়াতে পরমগুরু পিতার যেমন দুঃখ, তত দুঃখ পাড়া প্রতিবাসিগণের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই।

---

(২)

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ক্যাবলচন্দ্র রোজগারের প্রথম অবস্থায় বসন ভূষণে অতিশয় প্রিয় ছিলেন। নীল, পীত, লোহিত, অসিত-সিত বর্ণের—রঙ বেরঙের পোষাক শ্রী-অঙ্গে সুশোভমান হইত, বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্নের ন্যায়, ঘড়ি-বৃন্ত-সংলগ্ন বৃহত্তর সুবর্ণ-জিঞ্জির বিরাজ করিত; তদ্বীয় নাসিকাগ্রভাগস্থিতা-মনোমোহিনী

চসমা কত যুবক-কুলের মন হরণ করিত। ক্যাবল বাবু উঠন্তি বয়সে এইরূপই জবড়জঙ্গী বেশ-ভূষা করিয়া রাজ দরবারে গমন করিতেন। ক্রমে বহুদর্শিতা সাহায্যে বুঝিলেন, স্বয়ং কেবল মূল্যবান্ কাপড় জড়াইয়া সঙ সাজিয়া থাকা প্রকৃত ধনবান্ এবং বাবুর চিহ্ন নহে। সেইটী বুঝিবার দিন অবধি তিনি তাঁহারসহিত কোচম্যানকে আলপাকা প্রভৃতি কাপড়ের ভাল ভাল চাপকান চোগা বিতরণ করিলেন। কিন্তু এরূপ কার্য্যে তাঁহার মনস্তৃপ্তি হইল না, সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হইল—ভাবিতে লাগিলেন সমাজের কি অত্যাচার!— "আমি অর্থবান্ হইয়াও আশা মিটাইয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিতে পাই-লাম না,—আমার চাকর নফরে পরিতেছে, ইহা কি আমার সহ্য হয়? আমি যদি পরি, লোক আমাকে বুনিয়াদি বড় মানুষ না বলিয়া, নূতন বড় লোক বলিবে, সুতরাং (হয় ত) সমাজ আমাকে প্রকৃত বাবু বলিয়াও ডাকিবে না,—আমি কি হতভাগ্য!"

হতভাগ্য বাবুর দুঃখের ওর নাই! তখন পালকি গাড়ী করিয়া গমনাগমন করেন, তখন ভাবেন,—"আমি কি অধম, কোচম্যান আমার চাকর হইয়াও, আমার মাথার উপর বসিয়া গাড়ি চালাইতেছে। আমার গাড়ি, আমার ঘোড়া, কোচম্যান বেটা আমার বান্ধা মাহিয়ানার চাকর, তবু আমি এই কোচম্যা-নের পদানত! সমাজের কি অত্যাচার।" যৌবনের প্রারম্ভে ক্যাবলচন্দ্র ধর্ম্মসম্বন্ধে গোলযোগে পড়িয়াছিলেন! কি ধর্ম্ম মানিলে বেশী বাবু হওয়া যায়, তখন তাঁহার এই চিন্তাই প্রবলা হইল ভাবিয়া ভাবিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দিন

কএক পরে, বয়স একটু পরিপক্ক হইলে বুঝিলেন, এধর্ম্মে মজা নাই,—আশানুরূপ সুবিধা এবং সুখ পাইলেন না। আজ কালি লোক জনের সাক্ষাতে ৮২ সিক্কাওজনের টনটনে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া-পরিচিত; বাস্তুভিটায় বৎসর বৎসর মা দুর্গার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নবশাখ, ইংরেজ, মুসলমান সাধু, অসাধু, সজ্জন, অসজ্জন, সকল রকমেরই লোক নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কুৎসাপ্রিয় প্রতিবেশিগণ বলেন, লোকতার টাকার জন্য যত আটুপাটু, দুর্গোৎসবে তত টুকু— ততটুকু কেন, তাহার একতিলও, ভক্তি নাই।

স্নান আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করেন না; মা কালির সম্মুখে বলিদান না হইলে ছাগমাংস ভক্ষণ করেন না, যবনের সহিত একাসনে বসিয়া তামাক খান না;—তবে বিশ্বনিন্দুক লোকে কাণাকাণি করে, বাবু লুকাইয়া লুকাইয়া মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী খান, এবং ফাউল-কারিরও সহিত তাহার বিলক্ষণ গুপ্ত প্রেম আছে। এইরূপ শ্রীমান ক্যাবল-প্রকৃত বাবু নামে অভিহিত হইবার অভিলাষে, হিন্দুধর্ম্মের টীকা ললাটে ধারণ করত লুকোচুরি খেলাইয়া কাল কাটাইতেছেন।

শ্রীমানের যে কত দুঃখ,তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? লোকজনের সাক্ষাতে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারেন না—তাঁহার বড় লজ্জা করে। পাকি তিন পোয়া চাউলের কমত সে উদর-বিবর পরিপূর্ণ হইবার নহে?—কিন্তু বেশী আহার করা ছোট লোকের কায, নীচ-বংশোদ্ভব লোকের কায, এই ভাবিয়া আমাদের নায়ক, লোকজন—বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাতে ভয়ে পূর্ণ মাত্রায় আহার করিতে পারেন না। তেল মাখিয়া মুড়ি, চাল

কড়াই ভাজা খাইতেও বিলক্ষণ সাধ আছে, কিন্তু লোক লাজ-ভয়ে সে রসেতেও বঞ্চিত। বলা বাহুল্য, যখন নির্জ্জনে গুপ্ত-ভাবে অবস্থিত করেন,—তখন ইচ্ছামত অন্ন এবং মুড়ি, চাউল ভাজা উদরস্থ করেন; আর ভাবেন, “আমার কি দুরাদৃষ্ট—গোপনে রসনা পরিতৃপ্ত করিতেই কি আমার জন্ম হইয়াছিল?

সংবাদপত্রের গ্রাহক হইবার সাধ আছে; গৃহাভ্যন্তরে দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রের ছড়াছড়ি না থাকিলে লোকে বাবু বলিবে কেন? তবে মূল্য দিবার সময় মারামারি করেন—বাপরে বালাই রে ডাক ছাড়েন—এ কাগজ কিছু নয়, ইহাতে কেবল বাজে কথা,—মিথ্যা কথা লেখা থাকে—শীঘ্রই ছাড়িয়া দিব,—বলেন।

দানধ্যান করিবার মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা জন্মে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে খেতাব, সম্মান,—বিনা পয়সায়, শুধু শুধু ত, পাওয়া যায় না। আর দাতা না হইলেই লোকজনের নিকটই সম্ভ্রম থাকে কই?—লোকে যে কৃপণ বলিয়া ফেলিবে! সেই সময়ে শ্রীমান আমাদের বড় বিপদে পড়েন, ভেবে ভেবে তাঁহার সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার উপক্রম হয়। এ দিকে এক পয়সা মা বাপ—গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত; ওদিকে টাকা খরচ না করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিচিত হয়েন না—লোক জনের নিকট মান থাকে না। শেষে কি জনসাধারণের চক্ষে তাঁহার বাবুত্ব কম হইয়া দাঁড়াইবে?—সময়ে সময়ে এই ভাবনাতেই তিনি পাগলপ্রায় হইয়া উঠেন।

চাকর চাকরাণীকুলের উপর ক্যাবলচন্দ্র হাড়ে হাড়ে চটা;—কেননা তাহারা মাস পোহাইলেই মাহিয়ানা চাহে।

মাহিনা দিবার সময় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হয়—জীবনের মূলগ্রন্থী পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যায়।—কি জ্বালা কি যন্ত্রণা!—ও গুলোকে না রাখিলেও নয় (তা না হইলে আবার মান সম্ভ্রম থাকে না) রাখিলেও আবার মাহিনা দিতে হয়। সুতরাং মাসে মাসে দাস দাসীর বদল হয়; যে একবার আইসে, পুনরায় সে আর আসিতে চাহে না;—দূর হইতেই ক্যাবলরামের খুরে দণ্ডবৎ করে! নাপিত ধোবা, পুরোহিত, পাচক সকলেরই এইরূপ ব্যাপার। ক্যাবলচন্দ্রের বিশ্বাস—বড় লোক হইলেই একটা না একটা বড় ব্যারাম থাকিবে, যথা—কাশ, অম্বল, বহুমূত্র, হাঁপানি, মেহ ইত্যাদি। ক্যাবলরামের মহা ভাবনা, তাঁহার কেন ওসব ব্যারাম নাই?—তবে কি তিনি বড় লোক, বাবুলোক নহেন? দেহ যে কেন ব্যাধিগ্রস্থ নহে, এই মহা ভাবনা, মহাদুঃখে তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু উপায় ত নাই—কি করেন—অবশেষে মিথ্যা কথার আশ্রয় লইলেন; লোকের কাছে, বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন, "আমার আসম্যার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।" কখনও বলেন, "অম্বলের জ্বালায় গেলাম।" কখন যে কি কথা বলিয়া ফেলেন, তাঁহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে গার্হস্থ কবিরাজের এক আধটা বটিকাও লোক জনের সাক্ষাতে উদরস্থ করা আছে। তথাচ পর-ঐশ্বর্য্যদ্বেষী বিটল লোকে রটনা করে, "বাবুর ব্যারাম নাই।" এ সব কথা শুনিয়া ক্যাবলরামের কেবল গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়।

ক্যাবলরাম, প্রতিবেশী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, বাল্যকালের সমপদস্থ বন্ধু বান্ধবের উপর বিশেষ বিরক্ত; তাহাদিগকে দূর

হইতে দেখিলেই বিষম জ্বলিয়া উঠেন। কেন, কে বলিতে পারে তাঁহার মনের কথা, ভগবান ব্যতীত আর কে জানে? তবে সেই চিরকালের বিশ্বনিন্দুক বিশ্ব-অধিবাসিগণ বলেন—জাতি কুটুম্বের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র দশাপন্ন—অনেকেরই চালা ঘর;—জাতি কুটুম্বের সহিত সদালাপ করিলে, পাছে লোক মনে করে, ক্যাবলরামেরও এক দিন দরিদ্র দশা ছিল,—ইহাই তাঁহার দারুণ ভয়, সুতরাং জ্ঞাতি কুটুম্বকে চৌকাট ডিঙ্গাইতে দেন না। ধনবান লোকের সহিতই আমোদ, আহ্লাদ করিয়া কাল কাটাইতে তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। ক্যাবলচন্দ্র, নিজ বৈঠকে বসিয়া, পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া,—"এ জগতে, কে প্রকৃত বাবু, কেইবা প্রকৃত মানুষ"—কেবল এই সকল কথারই আলোচনা করেন। যেমন পরিপক্ক কাঁটাল ভাঙ্গিলে মাছিকুল সমাকুল হয়, মহা মহোৎসব হয়, ক্যাবলরাম এখন সেইরূপ দশাগ্রস্ত। সেই সভায়, তর্ক বিতর্কের পর প্রায়ই স্থিরীকৃত, হয়, এই নশ্বর জগতে, জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে, ক্যাবলচন্দ্রই বাবু—ক্যাবলচন্দ্রই মানুষ। শ্রীমান তখন আনন্দবিহ্বল হয়েন,—আনন্দাশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া ভূতলে পতিত হয়।

অপর কাহাকেও "বাবু" বলিলে ক্যাবল মনে মনে বড় বেজার হয়েন,—অসহ্য হইলে কখন কখন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ফেলেন, বলেন, "বাবু কে?" তর্ক বিতর্কের মজলিসে, এক দিন একজন নিরীহ ভাল মানুষ স্থূল-বুদ্ধি লোক, কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ বলিলেন, "মহাশয়! রসিক বাবু বড় মন্দ লোক নহেন।" তখন ক্যাবলরামের রক্ত-চক্ষু কপালে উঠিয়া বিষম ঘুরিতে লাগিল—ক্রোধে গাত্র-রোম সোজা হইয়া দাঁড়াইল; দাঁতকপাটি যাইবার

মত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "স্থূলবুদ্ধি! তোমার সংসারের জ্ঞান নাই। রস্‌কে আবার মানুষ—সে আবার বাবু?—যাকে তাকে বাবু বল—ইহা তোমার কোন্ দেশী আচরণ? তুমি জান, সে আমাদের চাকরেরও যোগ্য নহে; রামা, হরে, কেষ্টা, মোদো,—তুমি যে সকলকেই, ছত্রিশ জাতিকেই বাবু বলিতে আরম্ভ করিলে? পুনরায় এমন কথা আমার সাক্ষাতে উচ্চারণ করিও না! সাবধান!"

বাবু বিষয়ক তর্ক শুনিয়া কেবল বাড়ীর স্থষ্টিধর খানসামা বুঝিয়াছে,—যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা, জাল করে, লোককে কটুকথা বলে,—যে ব্যক্তি লম্পট, মদে যার অশ্রদ্ধা নাই,—আর এই সকল কাজের সঙ্গে যে প্রভূত টাকা রোজগার করে—সেই এ বঙ্গে বাবু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। স্থষ্টিধর, ক্যাবলরাম বাবুর খুব পিয়ারের চাকর।

মেমসাহেব।

১ নং

বঙ্গের মুখ-উজ্জ্বল-কারিণী, কুলের কমলিনী মিত্রদের বউ—শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র নূতন শ্বশুর গৃহে আসিয়া পাড়াকে সর-গরম করিয়া তুলিয়াছেন। মিসেস্ মিত্র বাঙ্গালা ভাষায় আউট্, ইংরেজী ভাষায় আউট্ হব হব হইয়াছেন, কারুকার্য্যগুলি পারিস্ এক্‌জিবিশনে কেবল পাঠাইবার অপেক্ষা আছে। আজ কাল তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তক পড়েন, এক বাক্স হামিওপ্যাথিক ঔষধ আলমারিতে আছে; গৃহের ঝিকে রোজ

প্রাতঃকালে উঠিয়া ১ ফোঁটা করিয়া ঔষধ খাওয়ান; অসভ্য দুষ্টা ঝি ঔষধের মর্ম্ম বুঝে না, মহৌষধ সেবনের সময় কেবল লুকাইয়া বেড়ায়। বৃদ্ধা ঝি একদিন অতি কাতর হইয়া বলিল —"বউ মা; রোজ ঔষধ খাইয়া আমারশরীরে আর কিছুই নাই, এক মুঠা অন্ন রোচে না, আমি এক সিকে মাহিনা কম্ নিতে পারি, কিন্তু আর ঔষধ খাব না।" মিসেস্ মিত্র অতি গম্ভীর ভাবে, নয়নদ্বয় বিস্তার করত ঈষৎ গ্রীবা দুলাইয়া বলিলেন— "হে গৃহদাসি! তোমার রোগের লক্ষণ কঠিন দেখিতেছি, তুমি আর অধিক দিন বাঁচিবে না—১০/১৫ বৎসর মধ্যে অবশ্যই তোমার দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে।"

"তবে চিকিৎসকের নিয়ম, রোগ যেমন কেন শক্ত হউক না অবশ্যই ঔষধ সেবন করাইবে; সুতরাং অদ্য হইতে আমি তোমার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইব। চাহিয়া দেখ, সেই এক ফোঁটা ঔষধে তোমার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, অঙ্গে বল সঞ্চার হইবে, বৈকালে মনও অতি স্ফূর্ত্তিতে থাকিবে"—বৃদ্ধা দাসী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই বৌমা আমাকে রক্ষা করুন—আমার তিন কুড়ি বছর বয়েস হলো, এজন্মে আমি ওষুদ কাকে বলে তা জানিতামনা—আজ একমাস ধরে আমাকে কেন ওষুদ খাওয়াচ্চেন, তা বল্‌তে পারি না—দোহাই মা আমাকে ছেড়ে দিন—বেলা হোলো, থালা পাথর কিছুই মাজা হয় নাই, দেরি হইলে গিন্নী আমাকেই বোক্‌বেন—আমি বুড় শিবের দিব্ব করে বল্‌চি,—আমার কোন ব্যারাম হয় নি"— কাদম্বিনী বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ্ কর চুপ্ কর, এ রোগ কথা কহিলে বৃদ্ধি পায়, তুমি ক্ষণেক আমার নিকট বসিয়া স্থির হও।

তখন বৃদ্ধা গতি মুক্তি নাই দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। মিসে মিত্র (স্বগত) আহা কি শোকের বিষয়, এযে উন্মাদের লক্ষণ দেখিতেছি ; এই মাত্র কতই প্রলাপ বকিল, আবার তখনি চক্ষে জল আসিল, এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার ; আমার যতদুর সাধ্য চিকিৎসা করিব প্রকাশ্যে বলিলেন—"বৃদ্ধে, গৃহদাসি, সংকটাপন্ন-জীবনে ! তুমি জান, রোগীকে ঔষধদান, এবং তাঁহার শুশ্রূষা করা রমণীর একটী প্রধান পবিত্র ধর্ম্ম,—তুমি সংবাদ-পত্রে অবশ্যই পড়িয়াছ, বিগত রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে কত শত মহিলা, আহত সৈনিকদিগের সেবা করিয়া কত প্রশংসার পাত্রী হইয়াছেন, কিরূপ পদ-গৌরব লাভ করিয়াছেন। তোমাকে অদ্য হইতে দিবসে তিনবার করিয়া প্রতিবারে দুই ফোঁটার হিসাবে ঔষধ খাইতে হইবে। তোমার ব্যায়াম আবশ্যক, এবং আজি হইতে তোমাকে প্রত্যহ সকালে বৈকালে ভাগিরথী-তটে রোজ একঘণ্টা করিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে; ইহাব্যতীত ১০৮ ডিগ্রী উত্তপ্ত জলে ২ টাকা গজ ফ্লেনেলের দ্বারা রাত্রি নয়টার সময় তোমার পৃষ্ঠ দেশে ফোমেণ্ট করিতে হইবে; পথ্য আজ হইতে চিকেন-ব্রথ এবং পাঁওরুটী।"—বৃদ্ধা দাসী কিছুই বুঝিতে পারে নাই,অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিল,—"বউমা উঠানে রোদ্ আসিয়াছে, এখনও ঝাঁট পড়ে নাই, আজ গিন্নী আমাকে বড় গালি দিবেন, শীগ্রি ছেড়ে দেন, আমি বড় গরীব, কখন কারু কিছু মন্দ করিনি—আমাকে কেন এমন কচ্চেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধা যাইতে উদ্যত হইল ; বউমা তখন, দাসী প্রকৃত উন্মাদ হইয়াছে দেখিয়া, বস্ত্রের দ্বারা, দাসীকে খাটের পায়ায় বাঁধিবার উদ্যোগ করিলেন। দাসী মহা আর্ত্তনাদে চীৎকার

করিয়া উঠিল। গভীর আর্ত্তনাদের শব্দ পাইয়া কাদম্বিনীর স্বামীর বুড়ী-মা দৌড়িয়া আসিল। বুড়ী মা তখন গো-সেবায় নিযুক্ত ছিল, শ্যামলী নাম্নী দুগ্ধবতী গাভীর সেবা স্বয়ং না করিলে তাঁহার মনঃপূত হইত না। হাতে-পায়ে গোবর, এলোথেলো কেশা, স্খলিত-মলিন-বসনা কাদম্বিনীর শাশুড়ী ঠাকুরাণী এই বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন—"বউমা, একি—একি," বউ মা উত্তর দিলেন—"চুপ্ চুপ্—গোল করিও না, রোগীর কষ্ট হইবে; আর তোমাকে একটা উপদেশ দি, তোমার এ বেশ কেন?—হস্ত পদে কৃষ্টবর্ণ মৃত্তিকাবৎ অপরিস্কার ওপদার্থ গুলি কি? সুগন্ধময় হনিসোপ দিয়া ওগুলি শীঘ্র পরিস্কার করিয়া ফেল, নচেৎ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা; আর এদেশে বিশেষ একটা কুব্যবহার দেখিতেছি,—তোমার অঙ্গে সেমিজের উপর কোর্ত্তা নাই কেন?—আমার সম্মুখে অন্ততঃ সেমিজ গায়ে দিয়া আসা উচিত ছিল—বৃদ্ধে, তোমার আবরণহীন বেশ দেখিয়া আমার অতিশয় লজ্জা করিতেছে,—কিন্তু তুমি স্বামী-নগেন্দ্রের জননী সুতরাং তুমি কিছু দয়ার পাত্রী,—তোমাকে আমার এই কোর্ত্তাটী দিলাম, শীঘ্র অন্তরালে গিয়া অঙ্গ বিধৌত করত উহা পরিধান কর! এই বলিয়া কাদম্বিনী—স্বামী-নগেন্দ্রের জননীর গায়ে একটা জ্যাকেট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কার্য্যগতি দেখিয়া বৃদ্ধা তারস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—"ওমা—একি হলোগো—ওমা—একি হলোগো বৌমা আজ এমন কচ্চেন কেন গো? আমার বউমাকে বুঝি আজ ডাইনে খেয়েছে, বাবা নগেন! কোথা গেলিরে?—একবার শিগ্‌গিরি আয়! বৃদ্ধার গলার শব্দ পাইয়া পাড়ার অনেক

প্রবীণা স্ত্রীলোক জমিয়া গেল। কাদম্বিনী তাহাদিগকে দেখিয়া অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"হায়, হায়, বঙ্গের কি দুর্দ্দশা—এই সকল ভগিনীগণ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখে নাই—ইহাদের অঙ্গে পরিহান নাই, পায়ে মোজা নাই, হস্তে পুস্তক নাই!" প্রবীণাগণ বলিতে লাগিল—"তাইত মা এযে সত্য সত্যই এঁকে আজ পাকা ডাইনে খেয়েছে। ওপাড়ার নাপিত বৌয়ের জলপড়া ভিন্ন কিছুতেই এ ডাইন ছাড়বে না।" নগেন্দ্র বেচারা স্কুল মাষ্টার ৩০৲ টাকা মাহিনা পায়—তাহাতে কুলায় না; আবার দুবেলা দুটী প্রাইভেট্ টুইশন আছে। সকালে তাই ডেপুটী বাবুর ছেলেকে পড়াইতে গিয়াছেন, ক্রমে লোক মুখে শুনিলেন—বাড়ীতে ভারি বিপদ। অমনি শশব্যস্তে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন—দেখিলেন বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—ভয়ে আর পা চলে না। তখন স্বামীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া, স্ত্রী সসম্ভ্রমে উঠিয়া স্বামীকে নিজ কক্ষমধ্যে লইয়া আনিবার জন্য অগ্রগামিণী হইলেন; এবং সেই লোকারণ্য মধ্যে সেক্হ্যাণ্ড করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। স্বামী লজ্জিত, অধোবদন, স্তব্ধ, মুখ শুকাইয়া গেল, চক্ষু কপালে উঠিয়া দাঁতকপাটী লাগিবার উপক্রম হইল; প্রবীণারা বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ! বড় শক্ত ডাইন, কচি বউটীকে একবারে হাড়ে হাড়ে খেয়েছে, জলপড়ার কর্ম্ম নয়; বদ্দীপুরের রামসুন্দর হাড়ী ওঝাকে আনিতে হইবে।" স্ত্রী ক্রমে গিয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"ছি। নাথ! আমার গাউন কৈ আনিলে না? তোমার প্রণয়িনীকে এ বেশে রাখিতে তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না?

নগেন্দ্র বাবুর মাতা বধূর ব্যাধি নিবারণের জন্য রাম সুন্দরে ওঝাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। গোলমালে দাসীটা যে কোথায় পলাইল, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিল না।

ভাল কে, সভ্য না অসভ্য।

গভীরতত্ত্ব গবেষণা„ জানি না, বাল্মীকি বেদব্যাস বেদ-বাই-বেল বুঝি না; হিউম-হালাম হামিণ্টনকে চিনি না; মিল-মেকলে মোক্ষমূলেরর সঙ্গে মিশি না; অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। তবে আসিলাম, ইংরেজের সঙ্গে মজিলাম, সংসার সাগরে ডুবিলাম, কত খাবি খাইলাম, তথাচ সভ্যতা কি— বুঝিলাম না। হায় যদি বুঝিলাম না, যদি এ স্বর্গসুধা পান করিতে পাইলাম না, তবে মরিলাম না কেন? খ্রীষ্টানের ইউরোপ সভ্য, কি, হিন্দুর ভারতবর্ষ সভ্য? ইরেজ সভ্য, কি বাঙ্গালী সভ্য? আজ এ ইংরেজরাজত্বে বসিয়া ইংরেজের মোহিনী বিদ্যায় মোহিত হইয়া, ইংরেজের জন্য জীবন ধারণ করিয়া, একথার উত্তর কেমন করিয়া দিব? যে ব্যক্তি পরের খায়, পরের ঘরে বেড়ায়, কিসে পরের জিনিসটী উদরসাৎ করিতে পারে, তাহার চেষ্টায় থাকে, তাহাকে সভ্য বলিব কেমন করিয়া? বল দেখি, ভাই! কে লোক ভাল? তোমার অসুখ হইল, আমি গিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করিলাম, ডাক্তার ডাকিলাম, পথ্যের জিনিস আনিলাম, গাত্র দাহের সময় গায়ে হাত বুলাইলাম; অসভ্য হিন্দুমতে ত এইরূপই বন্ধুর কার্য্য। কিন্তু সভ্য-সাহেবের ব্যবস্থা কি জান? পীড়ি-

তের গৃহে গিয়া বাহিরে দ্বারবান্ বা অপর কাহারও নিকট সাহেব নাম লিখিয়া রাখিয়া আসিলেন,—জানান-হইল, আমি তোমায় দেখিতে আসিয়াছিলাম। সাধারণত খৃষ্টান, চোখের দেখা দেখেন, হিন্দু অন্তরের সহিত দেখেন।

দেখ দেখি, হিন্দুর দান কেমন পবিত্র! ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিল, ক্ষুধায় অন্তর আকুল, পিপাসায় প্রাণ ব্যাকুল, হিন্দু তাহাকে অন্নজল দিল, শান্ত করিল। কিন্তু সাহেবের বাটী গেলে, সেই ভিখারিকে প্রথমে ত সাহেবের কুকুর কামড়াইতে আসিবে, কুকুরের হাতে প্রাণ বাঁচিলে চাপরাসীর গলা ধাক্কা খাইতে হইবে। ভিখারিকে দেখিয়া সাহেবের বিরক্তি বৈ দয়া হইবে না; অথচ সাহেব দাতা—সভায় যান, বক্তৃতা করেন, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে চাঁদা দেন—আর সেই দানের কথা লইয়া সংবাদপত্রে জয় ঢাক বাজে—সাহেবর দান সার্থক হয়। যদি কোন দরিদ্র প্রতিবাসী উপবাসী থাকে, হিন্দুর মন কাঁদিয়া উঠে; অমনি তাহাকে আপন গৃহে ডাকিয়া আনিয়া আহার দেন,—কিন্তু সাহেবের নিকটের বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নাই; সতত দূরদৃষ্টি। টিম্বকূটু কোথায় হয়ত জানেন না, সে দেশের লোক কেমন তাহা শুনেন নাই; যদি তারে সংবাদ আসিল, অগ্নিদাহে সে দেশের গৃহাদি পুড়িয়া গিয়াছে, লোক সব নিঃস্ব হইয়াছে এবং বিলাতে পাদরিগণ এজন্য চাঁদার খাতা বাহির করিয়াছেন, তাহা হইলে সাহেব অমনি শত যোজন দূরবর্ত্তী টিম্বকূটু অধিবাসীদের দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচাইবার জন্য চাঁদা দিবেন, অথচ পাড়ার লোক যে অনাহারে মরে, সেটা একবার দেখিবেন না। আবার এদিকে দেখুন, সাহেবের চারিটা খানসামা আছে,

দুইটা বাবুর্চি আছে, একটা পোষা বানর আছে ; একটা হরিণ আছে, দুটা পাখী আছে, কত টাকা, মিছা ব্যয়ে যাইতেছে ;— তাহাতে দৃষ্টিপাত নাই—কিন্তু ভাই আসিয়া যদি দুই দিন রহিল, অমনি ভ্রাতার নামে খরচের বিল হইল। তাই জিজ্ঞাসা করি, ভাল কে ? অসভ্য হিন্দু—না, সভ্য সাহেব ?

সভ্যতা-স্রোতে সত্য কথাও ভাসিয়া যাইতেছে। সভ্য-সাহেব বাড়ীতে আছেন,—কার্য্যে ব্যস্ত। চাপরাসী বলিল "সাহেব বাড়ী নাই ;"—সাহেব, ভৃত্যের এমনই সৎশিক্ষক। আগে আমাদের দেশে চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া দেনা পাওনা চলিত ; কিন্তু সাহেব সমাগমে, সভ্যতার বৃদ্ধিতে চন্দ্র সূর্য্য বড় আর কলিকা পান না, ক্রমেই উন্নতি হইল ; সূর্য্যের পরিবর্ত্তে সাদা কাগজে লেখা পড়া চড়িল, তার পর ইষ্টাম্প কাগজে পাকা দলিল হইল। কিন্তু তাহাতেও খুঁৎ বাহির হইল,—অবশেষে রেজষ্টরি—বিশেষ-রেজষ্টরি প্রথা চলিল,— কিন্তু তবুও সন্দেহ ঘুচিল না। সভ্যতার আঁটাআঁটিতে সকলে যেন অবিশ্বাসী ও অসত্য-বাদী হইয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয় ভাল কে ?

সাহেবী প্রেম কেমন ? সভ্য জাতির স্ত্রী, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একটা স্বামী লয় ;—স্বামী, স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া, আর একটা স্ত্রী লইতে পারে। ভালবাস, ভালবাসিব— আহার দিতে পার, তোমার হইব,—সুখে রাখ. মিষ্ট কথা শুনাইব,—পেলা দাও,গান গাইব ; সভ্য জাতির এইরূপ নীতিতে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যেন প্রেমের বেচা কেনা চলিয়াছে। কিন্তু হিন্দু রমণীর অতুলনীয়, অপরিমেয় প্রেমের

লক্ষণ সভ্য সাহেব-রমণীতে নাই। তোমার হৃদয়—আমার হৃদয় এক—এভাব সাহেবের আছে কি? সভ্য দেশে সতীত্ব বাজারদরে যেন বিক্রীত হয়। আদালতে ক্ষতিপূরণের টাকা দিলেই দুষ্ট লোক নিষ্কৃতি পায়। হিন্দু রমণীর সতীত্ব প্রাণের অপেক্ষা গরীয়ান—শুধু অর্থদণ্ডে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ভাল কে? সভ্য ইউরোপ ভাল, না অসভ্য হিন্দু ভাল? খৃষ্টান, না, হিন্দু? আমি মিল্ পড়ি নাই, বুদ্ধির ভ্রম হইতে পারে; যাহা সোজা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম, চিন্তাশীল পাঠক এবিষয়ের বিচার করিবেন।

বাস্তু ঘুঘু।

মানবদেহে যেমন চুলকণা, পশুর অঙ্গের যেমন মাছি, গাছের গায় যেমন কাট পীপঁড়া, সেইরূপ লোকসমাজে কতকগুলি বাস্তু ঘুঘু আছেন। ঘুঘুর চাল চুলা নাই, উদরান্নের সংস্থান নাই—কেবল গৃহস্থের প্রাচীরে বসিয়া "ঘু" "ঘু" আর সুবিধা পাইলে রন্ধনগৃহে ঢকিয়া দুধের কড়ায়ে মুখ দেন। নদীতে কুমীর আছে, বনে বাঘ আছে, স্বর্গে বেশ্যা আছে, সমাজে ঘুঘু আছে। মেঘ ছাড়া আকাশ নাই, কলঙ্ক ছাড়া চাঁদ নাই, সং ছাড়া যাত্রা নাই, গহনা বাতিক ছাড়া রমণী নাই,—ঘুঘু ছাড়া সমাজ নাই,—তবে কম আর বেশী। বঙ্গসমাজে আজ কাল যেন ঘুঘুর ধড়ফড়ানিটা কিছু অধিক মাত্রায় দেখা দিয়াছে। ঘুঘুগণ মোড়ের মাথায় দোকান খুলিয়া জটলা আরম্ভ করিয়াছে,

লাড়ুতে বিষ মাথাইয়া পথিককে বেচিতেছে; সুবুদ্ধি পথিকের তাহা তিক্ত লাগায় থুথু করিয়া ফেলিয়া দিতেছে। 'ইহাতে বঙ্গীয় সমাজের কোন ক্ষতি নাই—তবে দুইচারি জন তরলমতি বালকের হৃদয়ে যে হলাহল ঢালিয়া দেয়, পরকাল নষ্ট করে, এই যা দুঃখ। এ মশকের ভোঁ ভোয়ানি নিবৃত্তির জন্য, এই চামচিকার চিকচিকিনি থামাইবার জন্য কামান পাতিবার দরকার নাই,— তবে কিনা ইহারা দুই একটা ছেলে খারাপ করিতেছে, তাহাতেই দুই এক কথা বলিতে হইল।

বালকগণ নানা কারণে বহিয়া যাইতেছে। প্রথম, বিদ্যালয়ে অশিক্ষা। পণ্ডিত, গ্রাম্য পাঠশালে, বালককে শিক্ষা দিতেছেন, দেখ, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর স্নান করা উচিত,— বাহিরে স্নান করিলে গায়ে বাতাস লাগিয়া সর্দ্দি হইবে। গরীব বালকের একখানি বই ঘরনাই—তাহাও মাটীর; ঘরের ভিতর স্নান করিলে, মেজেতে কাদা হইলে, বালক শুইবে কোথায়.—সে বন্দোবস্ত গুরুজী করিলেন না; সাহেবের স্বাস্থ্য গ্রন্থে যাহা লেখা আছে, সেই বীজমন্ত্র, গুরু, শিষ্য-কর্ণে ফুকিয়া দিলেন। ধন্য গুরু! আর ধন্য গুরুর কর্ত্তাগুরু! তার পর বড় হইয়া স্কুলে ইতিহাস পাঠে বালক শিখিল, বক্তিয়ার খিলিজি সতের জন মুসলমান আনিয়া বঙ্গদেশ জয় করে, আর ক্লাইব, পলাশী-ক্ষেত্রে দুই হাজার ফৌজ লইয়া নবাবের যাইট হাজার সৈন্যকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করিয়া বঙ্গভূমি অধিকারে আনে;—এই ভুল শিক্ষা বালকের ক্ষীণ মস্তিষ্কে জন্মের মত নিহিত রহিল, অথচ বালক বয়োবৃদ্ধ সহকারে "ইতিহাসে পণ্ডিত" হইয়া উঠিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, দিলাম, আর্ক

মিডিস্ যে সব "প্রবলেম্" ঠিক করিতে পারেন নাই, তাহাও অকাট্যরূপে প্রমাণ করিলাম; ক্রমে পাইয়াগোরসের জ্যেষ্ঠ-তাত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু বাড়ীতে বৃদ্ধ ঠাকুরমা গরুর জন্য খড় কিনিয়াছেন, ৮৲ টাকা করিয়া কাহন, এক পণ ১৭ আটীর দাম কত? আমি অমনি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম, বিষম বিভ্রাট বুঝিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে ধীরে ধীরে তথা হইতে পলাই-লাম; পণ্ডিত হইলাম বটে, কিন্তু আমার মত মূর্খ দুনিয়ায় আর কেহ রহিল না! আমার উচ্চ শিক্ষা অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হইল,—

"পিতল কাটারি, কামে নাহি আয়ল,
উপরহি ঝকমক্ সার!

এই ত শিক্ষা; তাহার আবার কতরূপ বজ্র বাঁধন, নাগপাশ-ছাঁদন দেখুন,—সকল বালকের সমান চৌকস নজর হওয়া আবশ্যক, নহিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষেধ। অঙ্ক বিদ্যা পড়িতে প্রবৃত্তি নাই,—পড়া,—পণ্ডশ্রম বোধ করি, ভাল জানি না, প্রতিবারে আঁকে নম্বর কম হয় বলিয়া ফেল্ হই, প্রতি বৎসর সংসারের সকল আশা, সকল সুখ ফুরায়, অথচ জোর করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আঁকে পণ্ডিত করিবেন, আঁকে আধ নম্বর কম হয় বলিয়া অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে তাড়াইয়া দিল। আমি পথের ভিখারি হইলাম, বওয়াটে ছেলের খাতায় নাম উঠিল, পিতা কু-পুত্র মনে করিলেন,—অসার সংসার জগৎ জীর্ণারণ্য বোধ হইল। কেন বাপু, আমিএমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে একঘরে করিয়া তোমরা আমার ইহকাল পরকাল মাটি করিলে? তুমি বিজ্ঞ পণ্ডিত; তুমি বলিবে, "যে

বালক সাহিত্যে প্রতিভাশালী জীব, সে কি চেষ্টা করিলে আঁকে খেলা-রাখা-গোছ, 'তুকুড়ি সাত রাখিতে পারে না?" আমি বলি, প্রকৃতই পারে না, যাহাতে যার প্রবৃত্তি নাই, সে বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া বৃথা সময় নষ্ট ও শরীরক্ষয় করিবে কেন? আরও তুমি বলিবে, "একটু একটু আঁক না শিখিলে, সংসারে চলিবে কেন? সংসারে আঁক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কিরূপ শেখান হয়, তাহা ত কাহারও অগোচর নাই।

মানিলাম আঁক না জানিলে সংসার চলে না,—কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া, হাবুডুবু খাওয়াইয়া, বালককে সুখ-স্বর্গ হইতে অনন্ত নরকে ফেলিয়া দিলেই কি সংসার চলে? লঘু পাপে গুরু দণ্ড কেন? শাক চোরের ফাঁসী কেন? ঘরে মশা হইয়াছে বলিয়া ঘর খোড়ান কেন? সাহিত্য ইতি-হাসে আমাকে এণ্ট্রেন্স, এলে, বি, এ, পাস করাইয়া আমাকে না হয় একটু ছোট রকমের সার্টিফিকেট দাও না? অপরকে হীরা-খচিত, মুক্তার মালা বসান সোণার পদক দাও; আমাকে বিলাতী মুক্তা বসান, আট আনা খাদের একখানি রূপার পদক দাও;—তাহা না করিয়া আমাকে তাড়াও কেন? সংসারে ডোরকৌপীন ধারী ফকীর কর কেন? তাই বলিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় একটী বাস্তু ঘুঘু!

সমাজ-ঘুঘুদের উপদ্রবেরও ঝটিকা-আন্দোলিত ফুল্ল-নলিনী বৎ বালকের হিয়া থর থর কাঁপিতেছে। বালক বক্তৃতায় শুনিল, ইংরেজী-মতে বিবাহ না করিলে, সংসারে সুখ হয় না; বাইশ বৎসরের বালিকাকে কুললক্ষ্মী না করিতে পারিলে কুলের উদ্ধার হয় না, বিবাহের অন্তত ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে প্রণয়-

পাত্রীর নিকট আসা যাওয়া না করিলে, প্রেম পবিত্র হয় না। আর প্রণয়িনী ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে না জানিলে প্রণয়ে জমাট বাঁধে না। কুলোকের নিকট বালকের এই কুশিক্ষা জন্মিল, ক্রমে সংস্কার বদ্ধমূল হইল;—বালক অধঃপাতে গেল। এমনও শুনিয়াছি, এক জন পমেটম মাখা, টেরি-কাটা পরিপক্ক বালক একবার পিতামহকে বলেন, "যে রমণী ভাল ইংরেজী না জানে, এবং সংস্কৃতেও যাঁহার জ্ঞান কম, তাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি।" পিতামহ বলিলেন, "ভাই হে, বিদ্যাসাগর এবং টনি সাহেবকে একত্র না করিলে ত বিবাহ দেওয়া হয় না।" একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দেন। বাটিতে দুর্গোৎসব উপস্থিত, পিতা, জগন্মাতা দশভুজাকে প্রণাম করিলেন—অষ্টম-বর্ষীয়া পণ্ডিতা কন্যা বলিয়া উঠিলেন, "ছি বাবা! তুমি মাটীর পুঁতুলকে প্রণাম কর! গুরু মা বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পান না, তিনি নিরাকার।" পিতা বলিলেন, আমার দোষেই তিনি নিরাকার হইয়াছেন; দুদিন স্কুলে গিয়া তুমি যে শুকদেব গোস্বামীর মত "যোগ" শিখিবে, তাহা আমি জানিতাম না। এ সকলই ঘুঘুগণের "ঘুঘু" ডাকের ফল। অধিক কথা বলিব না, বালকগণ যেন বাস্তুঘুঘু দেখিলে একটু সাবধান হয়েন।

কুরুচি।

আজকাল এক আধ জনকে রুচি-রোগে ধরিয়াছে। রুচি-রাজ থাকিয়া থাকিয়া যেন চমকিয়া উঠিতেছেন, বাপরে! ঐ কুরুচি ঐ বাঘ—খেলেরে খেলে। ইহা মস্তিষ্কের বিকৃতি, হৃদয়ের পক্ষাঘাত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কোন বিষয়েই অতি বাড়াবাড়ি, কিছু নয়,—অতি শব্দটা অনেক সময়েই খারাপ। অতি মানে কুরুরাজ দুর্য্যোধন রাজ্য হারাইলেন, অতি দানে বলিরাজ পাতালে গেলেন, অতি-ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে য়িহুদিগণ বাস্তভীটা ছাড়া হইলেন, অতি তেজগর্ব্বে ফরাসী বিষদণ্ড জর্ম্মাণীর নিকট ভগ্ন হইল। আর অতি রুচি রুচি করিয়া কতকগুলা লোক আজ আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে। ইহাদের মনের মতলব কি, তাহা জানি না; তবে এই বুঝি, রোগ বড় বিকট।

রৌচিক পুরুষের লক্ষণ,—মুখ খুব গম্ভীর, হাসি একবারে নাই,, দূর হইতে দেখিলে বোধ হইবে, যেন ইহাঁর পুত্রটী অদ্য যমালয়ে গিয়াছে; অথবা নারিকেল গাছে যেন বাজ পড়িয়াছে, পুরুষ-প্রবর অতি ধীরে ধীরে, সতর্কতার সহিত ভাবিয়া চিন্তিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কন,—পাছে কুরুচি আসিয়া পড়ে। যদি কেহ একটু হাসিহাসি মুখে, তাঁহার নিকট গল্প করিল, "নদীরধারে বাগানে বেড়াইয়া মন বড় প্রফুল্ল হইয়াছে।" রুচি অবতার এই কথা শুনিয়া অমনি শিহরিয়া উঠিলেন,—হায়, হায়! কি করিলে বন্ধু!—একে নদীর জল ধীকি ধীকি বহিতেছে—তার উপর আবার বাগান, অবশ্যই সেখানে মল্লিকা. মালতী, যুঁই, ফুল

ফুটিয়া ছিল,—বন্ধু! বল দেখি, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ? সে যাহাহউক, সেখানে যখন তোমার মনে কুরুচি ভাব উদয় হইয়াছিল, তখন তিন বার তুমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলে কি?"

এত ভয় কেন? আমরা জানি, এমনও কেহ কেহ আছেন, যিনি প্রকৃত কুরুচির কার্য্যে যত বেশী লিপ্ত, তিনিই কথিত কুরুচি কথায় তত বেশী আতঙ্কগ্রস্ত! কোন নগরে একজন বাবাজী বাস করিতেন; প্রকাশ ছিল, লক্ষ হরিনাম না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না, আর লোক দেখিলেই উচ্চরবে "রাধে, রাধে, রাধে" বলিয়া উঠিতেন। ক্রমশ তাহার হরিনামের ঝুলি কিছু অধিক লম্বা হইতে লাগিল, তিলক ফোঁটা, কণ্ঠিমালা কিছু অধিক বৃদ্ধি পাইল। শেষে জানা গেল, প্রথম তিনি পাড়ার একজন মাত্র বৈষ্ণবীকে অনুগৃহীত করিতেন,—এখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, তিন চারি জন তাঁহার অনুগ্রহের পাত্রী। কোন কোন নব্য বাবু, ঠিক্ ঐ বাবাজী-প্রকৃতিক হইয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হেতু, পরের কুলবধূকে ক্রমে যত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গোপনে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন, ততই দিবসে লোকালয়ে তাঁহার রুচি মাহাত্ম্যের বক্তৃতা বাড়িতে লাগিল। কেহ যদি তাঁহাকে বলিল, "কদম্ব-বৃক্ষ" তাহার উত্তর হইল, "ছি ছি! ও কথা মুখে আনিও না,—কদম্ব নাম করিলেই আমার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ মোহন বাঁশী হাতে করিয়া আড় নয়নে গোপিনীদের পানে চাহিয়া আছেন—ক্রমে বস্ত্র-হরণেরও সব কথা স্মরণ হয়।" কদম্ব বলিলে, বরং রক্ষা আছে, দাড়িম্ব বলিলে, একবারেই মূর্চ্ছা,

বুঝি বা ডাক্তার ডাকিতে হয়। কোকিলের কূজন,ভ্রমরের গুঞ্জন ফুলের ফোটন সবই কুরুচি। জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় রমণীর নামে, মুচকি হাসির নামে, তিনি কেবল চমকে চমকে উঠিতেছেন। অপরাধী ব্যক্তি, চিরকালেই লাল পাগড়ী কনষ্টেবল দেখিলেই, মনে করে, বুঝি আমাকেই ধরিতে আসিতেছে!

আবার কতকগুলি-সুশীল সুবোধ ছেলে হ্যাপায় পড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া—কুরুচি, কুরুচি আরম্ভ করিয়াছে। তাদের কিছু দোষ নাই, তরলচিত্তে, যা শুনে তাই শিখে। ফল কথা, এইরূপ ভণ্ডামির বড় বিষময় ফল ফলিবে। যে ব্যক্তি, সংস্কৃতের কিছুই জানেন না, কবিত্ব রস কিছুই বুঝে না, সেও আজ কাল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কালিদাসের কাব্য অপাঠ্য কারণ কালিদাস কুরুচি! যে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ভগবদ্গীতা আছে, শান্তিপর্ব্বে যোগ-কথন আছে সে মহাভারত অপাঠ্য;—কেননা মহাভারতে, কুমারীকালে কুন্তীর সূর্য্যসঙ্গম ঘটিয়াছিল, পাণ্ডুর মাদ্রী সহবাসে মৃত্যু হইয়াছিল;—রামায়ণও অপাঠ্য, কেননা রামায়ণে রম্ভাবতী হরণের কথা আছে। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, থিয়েটার কুরুচি, বাইনাচ কুরুচি। রঙ্গভূমের সীতা দেখিলে, যাঁহার মনের ভাব বিকৃত হয়,বাইজির হস্তদোলন দেখিলে যাঁহার হৃদয় ভয়ে থর থর কাঁপে, তাঁহাতে মনুষ্যত্ব কম,—পশুত্বের প্রাধান্যই বেশী। পশুভাব প্রবল না হইলে, মন সহজে ও-রকম খারাপ হইবে কেন? যে সমাজে এইরূপ পশুভাব যত অধিক, সে সমাজে উন্নতি ততই কম। যে সমাজে পশুত্ব অধিক,সে সমাজে সাহিত্যের তেজ থাকে না, ভাল কাব্য রচিত হয় না, সেক্ষপীয়র জন্মগ্রহণ করেন না; সে

সমাজে সূক্ষ্মশিল্প লোপ পায়, চিত্রকার্য্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভাস্কর বিদ্যা অবনতির চরমসীমায় আনীত হয় Ecce Homo প্রণেতা তাঁহার Natural Religion নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;

First there is the great ideal of the artist. He has long cherished a secret grudge against Morality. The prudery of virtue is his great hinderances. He belives, that it is our Morality which prevents the Modern world from rivalling the arts of Greece. He finds that even the individual artist seems corrupted and spoiled for his business. If he allows Morality to get too much control over him. The great Master, he notices, how a certain indifference, a certain superiority to it, often they audaciously defy it." Natural Religion. P. 120--121

ভণ্ড রুচিওয়ালাদিগকে বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ মিষ্ট কথাগুলি উপহার দিয়াছেন ;—

"প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল! তা সে ঘোমটা টুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল—ব্রজেশ্বর, দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া আ! ছি! ছি। ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক্! সেই ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় বড় ডব ডবে চোখের নিচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেইস্থানে

আ! ছি! ছি! ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বিত করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।”

সকল বিষয়েই মাত্রা, ওজন, পরিমাণ আছে। সংসারে যদি রস রহস্য বাদ দিয়া; শকুন্তলা, ওথেলোর অগ্নিসংস্কার করিয়া; দিন রাত কেবল,

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"

আরম্ভ করি, তাহা হইলে বাস্তবিকই জগৎ মরুভূমিময় হয়, এক মহা শ্মশান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বালক।

কতকগুলা ছেলে বড় দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাব চরিত্র অতিশয় ঘৃণার্হ হইতেছে; যা মনে যায় তাই করে; গুরুজনের কথা গ্রাহ্য করে না—তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই! সহর এবং পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বালকই যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। পরিণামে যে কি হইবে, সে বিষয় তাহারা একদিনও ভাবে না; অথবা ভাবিতে জানে না।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বয়সের, যে শ্রেণীর বালকেরা গুরুজনের সাক্ষাতে অবনত বদনে থাকিত, এমন কি টেরি কাটিয়া বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিত, এক্ষণে সেই শ্রেণীর বালকগণ অম্লান বদনে তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া হুঁকা কাড়াকাড়ি

করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সতের আঠারো বৎসরের বালক কোথায় যত্ন করিয়া সারা দিন পড়াশুনায় মন দিবে;—তাহা না করিয়া ইয়ারকি এবং নেশার দিকে তাহাদের চঞ্চল-চিত্ত সতত ধাবিত হইতেছে। নেশা কি এক রকম!—মদ, গুলি, গাঁজা, সিদ্ধি—অনেককে এই চতুরঙ্গে চর্ব্বিশ ঘণ্টা বুঁদ হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে; বলা বাহুল্য, তাম্রকুটধূমপান তাহাদের নিকট কোনরূপ নেশার মধ্যেই গণ্য নহে। এরূপও দেখা গিয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই কতকগুলি বালক, মদ্য ও বেশ্যা—নেশাদ্বয়ে এরূপ মসগুল হইয়া উঠে যে, তাহারা যেন দিন রাত্রি অচেতন হইয়া থাকে। হিতোপদেশ বাক্য তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না, শিক্ষকের প্রহারে তাহাদের চমক হয় না, প্রতিবেশীর দুর্ব্বাক্যে গ্রাহ্য নাই। এই সকল বালক আপনা হইতেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে; অথবা কোন কোন সময়ে শিক্ষক তাহাদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া, শিক্ষক মন্দির হইতে—পিতামাতার বহু পাপের ফল সেই দুর্বৃত্ত বালকবৃন্দকে দূর করিয়া দেন। বিদ্যালয় ত্যাগের পর এই সকল বালক প্রতিবেশীর উপর উপদ্রব আরম্ভ করেন, সমাজের জ্বলন্ত কলঙ্ক স্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েন, পাড়ার শিষ্ট স্বভাব ছেলেকে স্বদল ভুক্ত করেন, মা বাপ আত্মীয় স্বজনকে কখন কখন প্রহারও করিয়া থাকেন। ছোড়াগুলা পরিণামে যে কি আছে, তাহা একবারও ভাবে না। পৈতৃক সম্পত্তি না থাকিলে উদরান্নের জন্য হা হা করিয়া কাল কাটাইতে হয়; অনেক সময় জালিয়াতি করিয়া জেলেও যাইতে হয়। আর পৈতৃক বিষয় থাকিলেই কি দুর্বৃত্তগণ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে

পারে? লক্ষ টাকা মুনফার বিষয় থাকিলেও সেই অবিমৃষ্যকারী কুসন্তানগণ অতি অল্প সময়েই অসৎকার্য্যে সমুদায় সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে।

বয়স্ হইলে এই সকল কাঙ্গালমস্ত সন্তানগণ আপনাকে আবার বড় বাহাদুর বলিয়া ভাবেন—এক জন প্রকৃত বীরপুরুষ জ্ঞান করেন। বীরপুরুষ বা নন কিসে? জননীকে, ভার্য্যাকে, ভগিনীকে যে প্রহার করিতে সক্ষম, তাহার বীরত্বের কম কিসে? তবে যদি বল যে, তিনি বীরপুরুষ হইয়া বারবিলাসিনীর পদাঘাত খান কেন? উত্তমাঙ্গে সম্মার্জ্জনীর প্রহার সহ্য করেন কেন? অবোধ লোকে না বুঝুক ক্ষতি কি!—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কেবল "বীর ধর্ম্মের" ফল (Chi valric spirit) "ন্যায্যানুরাগ" নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, বীরত্বের পরাকাষ্ঠা তাঁহারা আরও অনেক সময় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। থিয়েটারকোম্পানী দুপয়সা রোজগারের জন্য নাটকাভিনয় করিতে প্রস্তুত হউক দেখি? ষণ্ডামার্ক বালকগুলা জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া অভিনয়গৃহে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিবে। এরূপ বিকট চীৎকার করিবে যে, কর্ণে তালা ধরিবে, পরস্পর মারামারি করিয়া গুরু ব্যক্তির গায়ে গিয়া পড়িবে; সেই স্থানটিকে ভূতপ্রেতের আবাসভূমি মনে হইবে। সুতরাং বীরত্বের আর বাকি কি রহিল? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া গামছায় বাঁধিয়া, চাউল, কলা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া যাইতেছেন, বীরশ্রেষ্ঠ বালক তাহা খাইতে খাইতে চলিয়া গেল। শুভ্রকেশা, বিগত দশনা গোয়ালিনী কাঁধে কলসী লইয়া, যষ্টির উপর ভর দিয়া, দুধ যোগাইতে

গুটি গুটি চলিয়াছে; মায়ের মুখ-উজ্জ্বল সেই বীরাবতার বালক, অমনি অন্তরাল হইতে ঢিল মারিয়া দুধপূর্ণ কলসী ভাঙ্গিয়া দিল, আর হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোয়ালিনী বালককে গালি দিল, খানিক কাঁদিল, অবশেষে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। এরূপ কার্য্যে যদি বীরত্ব না হইবে, তবে ভব সংসারে আর কিসে বীরত্ব প্রদর্শিত হইবে বল?

বীর বটেন, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। কিন্তু মানুষ সর্ব্বগুণাউক্ষুত হয় না কিনা,—তাই রাত্রিকালে কখন কখন কুল-বধূর সাহায্য ব্যতীত বাহিরে আসিতে মহাপুরুষদের গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে; আর একলা বহির্গত না হওয়া বুদ্ধিরও কাজ বটে, কারণ ভূত ত মানুষ নহে, উপদেবতা; কাজেই দলবদ্ধ হইয়া তিমিরাবৃত রজনীতে প্রাঙ্গণে আসা মহাবুদ্ধির কার্য্য। অনেকে বলিতে পারেন, যদি তারা প্রকৃত প্রস্তাবে বীর, তবে সাদা রঙের মানুষ, আর লালপাগড়ি দেখিলে তাহারা এত ডরায় কেন? তখন তাহাদের বাক্য নিঃসরণ হয় না কেন? অচল, জড় পদার্থের মত প্রতীয়মান হয় কেন? তাহার কারণ আছে; সাধারণ নিয়মকে বিশিষ্টরূপে বলবৎ করিতে হইলে, এক আধটা ব্যতিক্রম থাকা আবশ্যক। সুতরাং তাঁহাদের ভয়ই তাঁহাদের বীরত্বের পরিচায়ক; তাঁহারা নিঃসন্দেহ বীরপুরুষ। যে দেশের বালক এরূপ দুরাচার, অক্ষম, কাপুরুষ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, সে দেশের কি আর মঙ্গল আছে? ছেলেপিলের যাহাতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষা সহবৎ অভাবে বালকগণের এরূপ দুর্ম্মতি উপস্থিত হইয়াছে। পিতা, মাতা—অভিভাবকগণ কিরূপে ছেলে মানুষ করিতে হয়, তাহা ভাল জানেন না। শিক্ষকও শিক্ষা দিবার প্রণালী উত্তমরূপ জ্ঞাত নহেন; উচ্ছৃঙ্খল বালককে শাসনে রাখিতে অক্ষম।

না পড়ালি পো,
তো সহবতে থো।

জনক জননী, বঙ্গদেশের এ বহুপুরাতন কথাটি ভুলিয়া যাইতেছেন। কাযেই ছেলেগুলা একেবারে বহিয়া যাইতেছে। হুগলী, চুঁচড়া, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি সহরে বিদ্যালয় যে নিতান্ত কম আছে, তাহা নহে। যে গুলি আছে, সেগুলিতে ভাল রকম লেখা-পড়া শিখান হইলে, বালকগণ এত খারাপ হইত না। অধিকাংশ শিক্ষকই যেন ঢিলে হইয়া গিয়াছেন; বালককে শিক্ষা দিতে, সদুপদেশ দিতে তাদৃশ যত্ন করেন না। সুতরাং বালকের জ্ঞানার্জ্জনের দিকে মতিরতি হয় না, কেবল দুশ্চিন্তায় মন পূর্ণ হইয়া থাকে।

আর বাপ মা ছেলেকে এত আদর দেন যে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহারা গুরুজনের মাথায় চড়িয়া নাচিতে থাকে! আপনার ছেলেকে কে না ভাল বাসে? কিন্তু সেই ভালবাসার ছড়াছড়ি করিয়া পুত্রের ইহকাল পরকাল নষ্ট করা কি উচিত? এরূপ স্থলে জনক জননী "মা বাপ" নামের অযোগ্য। যদি বালককে সৎ-শিক্ষা দানের অভাব ঘটে, তবে পিতা শত্রু মাতা বৈরী।

পল্লীগ্রামের বালক যে আর দুষ্ট হইবে, তদ্বিষয়ে বেশী কথা বলা বাহুল্য। দশখানা গ্রাম খুঁজিলে একটা পাঠশালা মিলিবে

না; ৫০ খানা গ্রামের মধ্যে একটা ছাত্রবৃত্তির স্কুল দেখিতে পাওয়া যায় না; এক সহস্র গ্রামের মধ্যে একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হইলেই যথেষ্ট; দরিদ্রের সন্তান, যাহারা সহরে যাইয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে না, তাহারা দিবা রাত্র হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে, পৃথিবীতে যত কুকর্ম্ম আছে, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছে।

পিতামাতাও অশিক্ষিত,- সন্তানের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানেন না। কাজেই বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। যে সকল শিক্ষিতলোক সমাজ সংস্করণে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল বাল্য-বিবাহ বা বহু বিবাহের ভাবনা না ভাবিয়া, যাহাতে বঙ্গীয় বালকের রীতি চরিত্র শুধরাইয়া উঠে, সে বিষয়ে আর একটু যত্ন করিলে ভাল হয় না কি?

রুচি-কাব্য।

প্রথম সর্গ।

আয়লো সুরুচি সতি! অনূঢ়া অবলা,
থান্-ফাড়া প'রে—মোটা, ঘন, লম্বাচোড়া;
কালকূট-ভরা কু-কণ্ঠের হও কর্ণধার,
দম, সতি! দুরন্ত সরস রসনায়—
গাব আজ রুচি-রসে মহা ঋষি-গীত।
তুমিও আইস ভবে সরলতা সখি,
আবরিয়া চারু-অঙ্গ,—সিমিজে কামিজে—

মুখে দিয়া জাল,—যথা থাকে গুটিপোকা
গুটির ভিতর। উভয়ে উড়িয়া আজি
উদ্ধার এ দীন দাসে, এ গীত-সঙ্কটে।
দূর হও কলঙ্কিনী কু-রূপা কুরুচি,
কালাপেড়ে— পরা; পায়ে মল শিরে সীঁথি
হাতে বালা, গলে মালা, নাকেতে নোলক,
পাণ-রাগে রঞ্জিত অধর টুক্ টুক্,
মিশি দাগে কলঙ্কিত দন্তপাঁতি তোর,—
ছি ছি ছোঁব না তোরে,—চাব চক্ষু মেলি,
সাধু-হৃদি কাঁটা তুই, দূর হ'রে এবে।
প্রেম তুই দূরে যা; 'ভালবাসা' আসিস্
না কাছে; ভয় হয় ভাবিলে ও ভাব।
তুই ও-মা বীণাপাণি ক্ষমা দে গো আজ,
বীণার ঝঙ্কার তোর কুরুচি আধার;
কটীতে কিঙ্কিনী-ধ্বনি, চরণে নূপুর—
(সাধু সঙ্গে থেকে) শুনে মা শিহরে সব
অঙ্গ,—কাঁপে হৃদি গুরু গুরু; যথা যবে
আশ্বিনের ঝড়ে রড়ে পড়ে কেঁপেছিল,
বাগানের কান্দি-পূর্ণ কলা-গাছ মরি!
বাজার মা বড় চড়া; আজিকার কালে
বিধি, বিষ্ণু, বামদেব কল্কে নাহি পায়;
উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগে,
হতেছে সত্যের জয় একটানা শুধু;
জননী গো ফিরে যা, এ ঘোর দুর্দ্দিনে,

শিক্ষা-গুণে রাঙ্গা-পদে বড় ভয়বাসি ;
সুরুচির শুভ্রকালে, আকাশের কোলে
চাঁদ তুই ডুবে যারে ; নিবুক নক্ষত্র ;
চন্দ্রমা গো হেসো নাহি আর রাঙ্গা রঙ্গে ;
বসন্তে বাসনা নাই, শীত হোক সদা ;
শুখাক্ কমলদল, শুখাক্ কুমুদ,
শুখাক নদীর জল, উড়ে যাক্ বালি,
পুড়ে যাক্ ফুল-কুল, কুঁড়ি কি ফুটন্ত,
কোকিল ভ্রমর দোঁহে বোবা হয়ে যাক্
আকার, ঈকার কিম্বা নীকার ঔকার—
লোপ হোক্ আজ হতে সুরুচি-রাজত্বে
বাজাও বিজয় ব্যাণ্ড, সুরুচির জয়ে।
আয়লো সুরুচি সতি রেলি থান প'রে
কাতর কিঙ্করে রক্ষ, উদ্ধার সঙ্কটে ।

ইতি প্রস্তাবনা নাম প্রথমসর্গ !

দ্বিতীয় সর্গ।

বসে আছে ভোলানাথ বিভোল হইয়ে,
—মিটি মিটি চায় কভু, কভু চোক বুজে,
বোতাম বিহীন কপ, ঝল্ ঝল্ ঝোলে
জীবন-বিহীন-ঘড়ি পকেটেতে দোলে,
কলপ-বিহীন গোঁপ সুবদনে সাজে ;
খাঁটী-হীরা-হীন আঙটী, অঙ্গুলীতে রাজে,

ধীরে ধীরে কথা কয়, বহে না নিশ্বাস,
পড়ে না পলক যেন, নাহি কাঁপে ঠোঁট—
মুখে নাহি হাসি কিম্বা দন্তের বিকাশ,
নত-শির বজ্রদগ্ধ আম্ড়া গাছ যেন।
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা, সুরুচি-রাজয়ে,
ডাকে কাক ডাকে বক, ডাকে কাদাখোঁচা,
চড়ুই, চামচিকা নাচে ঘুরিয়া চৌদিক;
ফুটেছে ধুতুরা ফুল, শোভে ঘলঘসি;
মাচায় উঠেছে পুঁই,—সুগম্ভীরে ধীরে।
হে দানবপতি ময়! দ্বাপরের শেষে
তুষিতে পৌরবে, রচিলে অপূর্ব্ব সভা;
তার শোভা কোন্ ছার, এ শোভার কাছে?
স্বভাবের শোভা এই, কৃত্রিমতা নাই।
মহা-ঋষি ভোলানাথ আরম্ভিল তপ,
যুক্ত করে, ঊর্দ্ধমুখে ব্যোম পানে চাহি,
চক্ষে বহে জল—জীবের উদ্ধার হেতু।
"দয়াময় দীনবন্ধু প্রভু! পার কর
এ ভব-সাগরে, দুর্বিনীত দুষ্ট জীবে;
কু-কথায় কণ্ঠভরা, কু-চক্রী তাহারা
কথা নাহি শুনে মোর, না মানে আমায়,
(মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়,
—সংসারে একাকী আমি, বন্ধুবল নাই,
কেমনে শাসিব কোটী কোটী জীবে
—তাই আজি ডাকি তোমায় জগবন্ধু

'নর-বিপরীত—জাতির সে, নাম ধ'রে
ডাকে? শুনে লাজে মরি, অঞ্চলে লুকাই
মুখ; হৃদাকাশে কু-ভাবের কাল-মেঘ
হইলে উদয়, পোড়ে বক্ষ দাবানলে;
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যশোদাজীবন-ধন শ্রীকৃষ্ণের সাথে
দহিল খাণ্ডব বন, নির্ম্মূল করিয়া।
প্রভু! পারি না সহিতে আর'ও কু—কথা,—
হিয়া জর জর;—ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অসি করে ধরি, ধরিয়া চামুণ্ডা মূর্ত্তি,
বধি তারে রণে;———"
"হায়? হায়? কি কহিতে কহিনু; ভুলে
গেছি যা! "নর বিপরীতমূর্ত্তি!" ধরিব রে আমি!
রসনা! খসিয়া পড়, কণ্ঠ! রুদ্ধ হও,
ঠোঁট! নড়িওনা—এপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!
কি কথা কহিনু। নিজ পদে মারিনু কুঠার
নিজ দোষে মুখ পোড়া হনু মহাবীর—'
বলিতে বলিতে হায়, নয়নের বারি,
বিগলিত হলো, নিশ্বাস বহিল ঘন,
শোক-ঝড় উঠিল আকাশে; ভোলানাথ
ভূমিতলে গেলা গড়া গড়ি; কলেবর
ধূলায় ধূসর; ফেনিল বদন; জিহ্বা
পড়িল বাহিরি; চেতনা নাহিক আর;
পড়েছে জটায়ু যেন রাবণের বাণে,

যবে শ্রীরামের " নরবিপরীত মূর্ত্তি"
রাবণের রথে দেখি' যুদ্ধিলে জটায়ু।
কতক্ষণ পরে তবে পাইয়া চেতন,
ভোলানাথ দিব্য জ্ঞান লভি, ধীরে
বাম হাতে মলি দুই কাণ পুন সেই
হাত বুলাইল মুখে; কার্য্য সিদ্ধি করি
ডান করে চাকু ছুরি দৃঢ়বদ্ধ ধরি
বলিল সক্রোধে "রে রসনে! ফের্ যদি
শয়নে স্বপনে কিম্বা নিদ্রা অচেতনে
বল আর, অই কথা—কুচি কাটি কাটি
তোরে ফেলাইব সমুদ্রের নীরে দূরে"
ইতি প্রতিজ্ঞা নাম দ্বিতীয় সর্গ;

ব্রহ্মডাঙ্গায় কুলগাছ।

বাঙ্গালা ভাষা যেন নাওয়ারিশ মাল—যেন ব্রহ্ম-ডাঙ্গার কুলগাছ, যার ইচ্ছা সেই দখল করে,—দুটা কুল পেড়ে খায়। আজ কাল অনেকেরই গ্রন্থকার সাজিবার বাসনা; কিন্তু সাজিলে হয় কি? পরচুলায় তো টাক রোগ সারে না; মেষ, সিংহচর্ম্মে আবৃত হইলেও তো সিংহধর্ম্ম পায় না; বর্ণজ্ঞানহীন মানব শুকদেব গোস্বামীর মুখস্ পরিলে ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কিন্তু এ কথা শুনে কে? ঢাল নাই, হাতিয়ার নাই, সদাই নিধিরাম সর্দ্দার সাজিবার সাধ। ইহাতে নিজের বিড়ম্বনা, সমাজের অবমাননা,

ভাষার লাঞ্ছনা, গুরুজনের গঞ্জনা, আর গ্রাহকগণকে বঞ্চনা ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। বাপু হে! জিজ্ঞাসা করি, তোমার পক্ষঘাত-গ্রস্ত অর্দ্ধমৃত, বিশুষ্ক হাতে কি বলিয়া তীক্ষ্ণধার তলোয়ার ধরিতে চাও? ইহাতে তোমার লজ্জা না হউক, কিন্তু অপরে বড়ই লজ্জিত হয়। ছেলেপিলে কোথায় লেখা পড়ায় মন দিবে,—পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিল; পুস্তকের মলাটে পদ্য লিখে, অঙ্কের খাতায় পদ্য লিখে—যেন দ্বিতীয় রামপ্রসাদ অবতীর্ণ। আবার এখনকার বাপ খুড়াও যেন কেমন কেমন হইয়াছে; ভাবিল ছেলের বুঝি দৈববিদ্যা জন্মিয়াছে, হয় ত শিক্ষককে নিষেধ করিয়া দিলেন, ছেলেকে যেন অঙ্কশাস্ত্রের জন্য পিড়াপীড়ি না করা হয়,—কবি কখন আর্কিমিডিস্ হইতে পারে না,—পদ্যের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের চিরদিনই ভাসুর ভাতৃবধূ সম্পর্ক। এদিকে পরিপক্ক ছেলে আর নীচে পানে চান না, এক দৃষ্টে নীল-নভোমণ্ডলর দিকে তাহাইয়া থাকে; নীচে কেবল পার্থিব গদ্যের জঞ্জাল, উপরে কেবল স্বর্গীয় পদ্যের বাগান; উপরে চাঁদ, নীচে গোবর; উপরে মলয়মারুতসেবিত সরস-বসন্তে মধুকর গুণগুণায়তে, নীচে গ্রীষ্মের গুমট গরমে মাছি ভণভণায়তে,—স্বভাবত কবি আর নীচে চাহিবে কেন? নয়নতারা দুটী কপালে চড়িয়াই রহিল; যেন ব্রহ্মরন্ধ্রে চক্ষু হইলে সুবিধা কিছু বেশী হইত। এইরূপে স্বভাব-কবি হেলে-দুলে মুচ্‌কি হেসে; বাহু তুলে বিহ্বল হয়ে, কবিত্ব-কাননে বেড়াইয়া বেড়ান। স্বভাব-কবি লইয়া ত এই জ্বালা, দ্বিতীয় জ্বালা স্বভাব-গ্রন্থকার লইয়া। কেরাণী-গিরি জুটিল না, নব্য বাবু গ্রন্থ লিখিতে 'বসিলেন।' বুকে চাদর-বাঁধা; টেড়ি-কাটা

পমেটম-মাখা "এলে ফেল" বাবু গ্রন্থ লিখিবার আড়ম্বরে নগর তোলপাড় করিয়া তুলিলেন—সহসা যেন ভূকম্প উপস্থিত হইল। ভরসা, কেবল একমাত্র 'বিজ্ঞাপনে।' রামচন্দ্র হনুমানের সাহায্যে সীতার উদ্ধার করেন, গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাহিত্যসাগর তরিতে চাহেন। হয়ত নরপুস্তকের দুপাতের অধিক কালীর আঁখর পাড়া হয় নাই, গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন দিলেন, "বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন।" বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নূতন পুস্তক। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। দুই হাজার ঝাপা হইতেছে, ইহার মধ্যেই ১৯৯৯ জন গ্রাহক হইয়াছে। গ্রাহকগণ অতি শীঘ্র পত্র লিখিবেন; একমাসের মধ্যে মূল্য দিয়া গ্রাহক না হইলে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হইবে। ইহাতে সাগরগর্ভউত্থিত ধন্বন্তরীর সুধাভাণ্ডের অমৃত আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র আছে, ভবানীপতি মহাদেবের ত্রিশূল আছে, শ্রীকৃষ্ণের মোহনবাঁশী আছে, গোপিনীকুলের মধুর হাসি আছে, মিল আছে, মোক্ষমূলর আছে, গেটে আছে, সাড়ে আঠার ভাজার সকলি আছে,—এখন উন্নতমনা পাঠক-বৃন্দ এই গ্রন্থ এক এক খণ্ড পাঠ করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করুন, স্বদেশ উদ্ধার করুন।" বিজ্ঞাপনের ত এই প্রথম আরম্ভ, ইহার উপর আর কত বক্কাল আছে,—ক্রমে লেখা হইল—"মার্জ্জনীয়া রমণীকুলের অনুনয় বিনয়ে গ্রাহকগণকে অর্দ্ধমূল্যে আরও দুইবৎসর সময় দেওয়া হইল।"

এই সকল গ্রন্থকারের একটি মহাভয়, পাছে—পাঠক মনে করেন, গ্রন্থকারের বিদ্যা কম বা তিনি কম-ইংরাজী জানে। সেই ধারণা দূর করণার্থ আবার নানা কৌশলের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থ

মধ্যে দেখিবেন, লাটিন্, জর্ম্মাণ, ফরাসী ভাষার মধ্যে মধ্যে কোটেসন্ ; কোন্ পাতের শেষে লেখা আছে, "See Mill on Liberty" 'See Dequiency on Keat." "Vide the Holy Bible." অথবা—কোথায় দেখিবেন, "গেটে অমুক দিন অমুক কথা বলিয়াছেন ;" "বেদে ঠিক্ এই কথা লেখা আছে ;" "হোমার এই বিষয়ের সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন।" প্রথমত, গ্রন্থকার হইয়া চীনেবাজারী দোকানদারী, তাহার উপর আবার বিদ্যা দেখাইবার আড়ম্বর—এই ত্র্যস্পর্শে ঐ গ্রন্থ প্রকৃতই বঙ্গভাষায় এক নূতন অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়া উঠে।

গ্রন্থকারের কথা ছাড়িয়া দি। এক্ষণে আর এক ধরণের নূতন লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের সুর সদাই পঞ্চমে চড়িয়াই আছে,—তাঁহাদের লেখার সরু মোটা নাই—নরম গরম নাই ; মিঠেকড়া নাই,—যেমনজিনিষ হউক, সেইএকছাঁচে ঢালিতেছে। "মাঠের ধান শুকাইতেছে, যদি আর সাত দিন মধ্যে বৃষ্টিনা হয় তাহা হইলে এবার অর্দ্ধেকের বেশী ফসল নষ্ট হইবে।" শুধু এই কথাটী তাঁহাদিগকে লিখিতে বলুন, দেখিবেন, তাঁহারা কি একটা ভয়ানক কাণ্ড করিয়া তুলেন। তাঁহাদের লেখার ধরণ এইরূপ,—"অহহ! কি দুর্দ্দৈব। শস্য শ্যামলাবসুন্ধরার কমনীয় কান্তি আজ পরিম্লান ; তৃণশষ্পসমচ্ছাদিত ময়দানের নন্দন কানন তুল্য সে অপার্থিব সৌন্দর্য্য আর নাই,—হরিদ্বর্ণ ধান্যপুঞ্জ-বিশুষ্ক-জীবন হইতেছে,—ঔষধাভাবে আপশ্লেষ্মি রোগগ্রস্ত-রোগী যেন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অদ্য হইতে সপ্তদিনের মধ্যে পর্জ্জন্যদেব যদি অনুগ্রহবারি বর্ষণ না করেন, তাহা হইলে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি

অর্দ্ধেকের অপেক্ষা—অধিক সার শস্য বিনষ্ট হইয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের পীড়া উৎপাদন করিবে !" আজকাল অনেকের এই রূপ একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে, ভাষা মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ঘোর নিনাদ করিতে না পারে, যে ভাষা সিংহবিক্রমে হুঙ্কার রবে শ্রোতার কর্ণ বধির করিতে সক্ষম না হয়, সে ভাষা ভাষাই নহে। এরূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। সকলই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত হইয়া থাকে। প্রাতে ললিতে সুর ধর, দ্বিপ্রহরে সিন্ধু, সন্ধ্যায় পুরবীর আলাপ কর—শুনিতে কেমন মিষ্ট লাগিবে। তাহা না করিয়া, তাঁহারা দিনে বেহাগ, রাত্রে ভৈরবী করিয়া তুলেন। উপসংহারে আমাদের কথা এই, প্রথমে শিক্ষা চাই, ভূয়োদর্শন চাই, ভাষা জ্ঞান লাভ করা চাই, বানান ভুল দুরস্ত করা চাই,—তার পর দিন কত মক্স করুন,—লিখুন, কাটুন, আবার সংশোধন করুন, কাগজ ছিড়িয়া ফেলুন, এইরূপ আট-ঘাট বাঁধিয়া শেষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, কবি হউন গ্রন্থকার হউন, প্রবন্ধ-লেখক হউন, ইহাতে সকল পক্ষেরই মঙ্গল আছে।

জামাই বাবু।

নীলমণি বাবু অতি স্বাধীন প্রকৃতির লোক। চেহারা খানি একহারা—পাতলা ডিগ্‌ডিগে, হাড়েমাসে জড়িত। তাঁহাতে শারীরিক বল, আধিভৌতিক বল, না থাকুক; কিন্তু তাঁহার দেহাভ্যন্তরটা আধ্যাত্মিক তেজে ভরা। চব্বিশ ঘণ্টাই অগ্নিশর্ম্মা; মুখের কাছে, কথা কয়, সাধ্য কার? যেন অগ্নি-

স্ফুলিঙ্গ—প্রতিলোমকূপ দিয়া সদাই যেন একটা ঝাঁজ বাহির হইতেছে। তিনি যখন তখন মুখে এইরূপ বুলি বলিতেন, "আমি কি কারো তোয়াক্কা রাখি; হক্ কথা বল্‌বো, তা বাবাই হোক্ না কেন, আর গুরুই হোক্ না কেন?"

নীলমণি বাবু চিরকাল "ঘর-জামায়ে।" চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহার শুভবিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের ক দিন পরে, বা ক সপ্তাহ পরে, তিনি শ্বশুরগৃহে এই চির-অবস্থিতির সূত্র পাত করেন, তাহা আমার জানা নাই। তবে এমনটা শুনিয়াছি, তিনি ফুলশয্যার পর দিনই, বাপের বাড়ী হইতে নবপরিণিতা স্ত্রীর সহিত এক পাল্কীতে শ্বশুরবাড়ী আগমন করেন; সেই দিন হইতেই তাঁহার "ঘরজামায়ে" কাজের সূত্রপাত।

নীলমণি বাবুর শ্বশুর সেকেলে সেরেস্তাদার। তালুক মুলুক আছে। এখন সুদি কারবারে খুব বড় মানুষ। কৌলী-ন্যের অনুরোধে তিনি নীলমণিকে জামাই করেন। জামাইকে ঘরে আনিয়া তিনি প্রথমে গ্রাম্যস্কুলে তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। নীলমণি বাবুর পাড়াগেঁয়ে স্কুল মনে ধরিল না, কাজেই শ্বশুর তাঁহাকে হুগলীতে পাঠাইয়া মাসিক ২০৲ টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। লেখাপড়া শেষ হইলে, ঘরের জামাই, শ্বশুর-ঘরেই ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে বয়স্ প্রায় ২৮ হইল! নীলমণি বাবুর ঘুম্ ভাঙ্গে বেলা আটটার সময়। তার পর তিনি মুখ হাত ধুয়ে চা খান। চা খাইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। বেলা বারটার সময় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার পূর্ব্বক, দিবা নিদ্রায় অভিভূত হন। বৈকালে উঠিয়া পাশা খেলিতে বসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জলযোগ করিয়া, আবার পাশা এবং তাহাকে

মনোযোগ দেন। এক মটর আপিং খান। এইরূপে শ্বশুরের কার্য্য-উদ্ধার করিয়া নীলমণি বাবু দিন অতিবাহিত করেন।

নীলমণি বাবু নানাগুণে বিভূষিত। শ্বশুর তাঁহার উপর এত অত্যাচার করে, তথাচ তিনি শ্বশুরবাড়ীর উপর বিরক্ত হন না। তিনি আপিঙ সেবন করেন, রাত্রে দুই সের দুধের দরকার;—কৃপণশ্বশুর পাঁচ পোয়া বই দুধের বরাদ্দ করেন নাই! দিনের বেলা ভাতের সঙ্গে যে অন্তত এক ছটাক ঘি দিলে নীলমণি বাবুর সুবিধা হয়, পোড়া শ্বশুর তাহাও বুঝে না॥ নীলমণি বাবু এত ভালমানুষ যে,'এসব মর্ম্মকথা শ্বশুরের সাক্ষাতে এক দিনও বলেন না; কেবল দুই এক জন প্রিয়বন্ধুকে গোপনে বলেন,—"এমন ক"রে আর থাকা যায় না, আপনারা ভাল খাবেন, আর আমাকে কেবল ওঁচা জিনিস দিবেন।"

নীলমণি বাবুর পিত্রালয়ে যে কি আছে, তাহা কেহ জানে না। তিনি সর্ব্বসমক্ষে বলেন যে, আমার বাপের বাড়ীতে বড় বড় ঘর আছে, বড় বড় বাগান আছে,—বড় বড় পুকুর আছে। সবঁই আছে, কেবল বাপের বাড়ীর বাপ্‌টী নাই। কিন্তু দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করে, পিত্রালয়ে তাঁহার চাল চুলা নাই ভাঁটা নাই, একটা ভেরেন্দা গাছও নাই।

বারমেসে কালী ঠাকুরুণ দেখিয়াছি, বারমেসে আমগাছেরও নাম শুনিয়াছি। কিন্তু নীলমণি বাবুর মত বারমেসে জামাই পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। পাড়ার লোকে তাঁহার "বারমেসে" নাম দিয়াছিল; তবে তাঁহার সাক্ষাতে কেহই সে নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। নীলমণি নাম একটু বাঁকা করিয়া বলিলেই তিনি ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেন, বারমেসে

জামাই বলিলে কি তিনি আর রক্ষা রাখিতেন ? সকলকে একেবারে উবু উবু গিলিয়া ফেলিতেন। তবে অনেকে তাঁহাকে প্রকারান্তরে ঠাট্টা করিত। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কয়েকটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। নীলমণি বাবু গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে অমনি মহাসমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন,,—"আসুন, নীলমণি বাবু, আসুন, আসুন, বোস্‌তে আজ্ঞা হউক"—আদরে নীলমণি অমনি গলিয়া গেলেন, তখন নীলমণিকে মধ্যস্থলে বসাইয়া সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। কোন ব্যক্তি অতি সুজোরে চেঁচাইয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—"—ওরে, শীগ্‌গির বাবুকে তামাক দে," ভৃত্য হুঁকায় জল পুরিয়া আমপাতায় একটী নল করিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া নীলমণির হস্তে হুঁকাটী দিল। ১ম ব্যক্তি বলিলেন,—নীলমণি বাবু, ইহা কোথাকার আমপাতা জানেন না কি ?

নীলমণি। না, তাত জানি না বেশ ভাল পাতা বোধ হচ্চে।

১ম। অতি উৎকৃষ্ট পাতা ; আমার বারমেসে আমগাছের পাতা কখন খারাপ হয় না।

নীলমণি। বারমাসই কি আপনার গাছে আম হয় ?

২য়। বারমাসই হয়, একটী দিনও কামাই নাই।

৩য়। অতি সুন্দর আম, বারমেসে গাছ—রোজ আম পেড়ে খাও।

নীলমণি। আমার বাপেরও একটা বারমেসে আমগাছ ছিল।

১ম। শুনেছি, শুনেছি,—আপনার পিতাঠাকুরের খুব

এক বড় আম বাগান ছিল, বাগানের মধ্যস্থলে সেই বারমেসে গাছটী থাকিয়া বাগান আলো করিত। নীলমণি বাবু, সে বাগান এখন হলো কি ?

নীলমণি। আর কি বোলবো মোশাই, থাক্ সে কথা।— আমি কি এখন আর একটী আম চোখে দেখ্‌তে পাই—সে সব আম ভূতে লুটে খায়।

১ম। কেন নিজের বিষয় আশয় সম্পত্তি আপনি দেখেন না ? আপনার ত অনেক ক্ষতি হচ্চে, আমরা দেখিতেছি! দেখে শুনে আমাদের কষ্ট হয়।

নীলমণি। ও ত শুধু আমগাছ ; আমার বড় পুকুরের বড় বড় মাছগুলো কেবল না দেখার দরুণ মরে গেল।

২য়। আমাদের সকলের অনুরোধ,—আপনি একবার বাড়ী যান। আপনার বিষয় দেখুন, শুনুন, রক্ষা করুন, এরূপ সম্পত্তি না দেখিলে চলে কি ?

নীলমণি। হুঁঃ আপনারা ত আমাকে যেতে বল্লেন,— আমাকে শ্বশুর ছেড়ে দেন কৈ ?

৩য়। আপনি শ্বশুরের হাত ছিনিয়ে চলে যান, এতে যা সাহায্য করিতে হয়, তা আমরা করবো। পুলিষ কেশ হয়, আমরা চালাবো। আপনি নির্ভয়ে চলে যান। শ্বশুর যদি এসে পথ আট্‌কান, আমরা যেয়ে তাঁহার হাত ধোরে পথ থেকে টেনে আনবো।

২য়। শ্বশুরটার কি আক্কেল দেখেচো—জামাই বাবুকে আট্‌কে রেখেছে।

১ম। কাজেই আগুলে রাখতে হয়। বাবুকে না হ'লে

যে শ্বশুরের একদণ্ড চলে না, সংসার অচল হয়—কাজেই নীলমণি বাবুকে আগুলে রাখ্‌তে হয়।

নীলমণি। ঠিক্‌ বলেছেন,—আমি না থাক্‌লে, এতদিন শ্বশুরের বিষয় আশয় সব মাটী হতো। এমন আর বিনা মাহিনার চাকর কোথা পাবেন?

১ম। আপনি এই ১৪ বৎসর কাল এখানে আছেন; মাসে যদি আপনি ১০৲ টাকা করিয়া পাইতেন, তাহা হইলে আজ আপনার দুই হাজার টাকা হাতে হইত। আপনি নেহাইত ফাঁকিতে পড়িয়াছেন। শ্বশুরই আপনার পরকালটা খাইল। আপনি আজই এখনই বাপের বাড়ী চলে যান। আমরা চাঁদা করিয়া আপনার রাহা খরচ দিচ্চি।

নীলমণি। (একটু বিচলিত হইয়া) আমিত পিত্রালয় যেতে অরাজি নই, তবে আমি গেলে শ্বশুরের কষ্ট হয়, এই আমার দুঃখ। তা কালই যাবো,—শ্বশুর মহাশয়কে বুঝিয়ে বলে, কাল যাবো। আজ আমি তবে আসি। এই বলিয়া বেগে সেস্থান হইতে নীলমণি বাবু প্রস্থান করিলেন। এরূপ শুনা গিয়াছে, তিনি তিন মাস কাল সে পথ মাড়ান নাই!

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত!

কাটা-আইন।

দয়াল বাবু খুব বিষয়ী লোক। সংসারের সারতত্ত্ব সমস্তই তিনি অবগত আছেন। তিনি বলেন, এ সংসারে সবই দোকানদারী। দুনিয়ার হাটে, আদান প্রদান এবং বেচা কেনা ব্যতীত আর কোন কথা নাই। মনুষ্য এ জগতে ব্যবসা করিতে আইসে, ব্যবসা শেষ হইলে চলিয়া যায়। মজা দেখুন, পৃথিবীর সকলেই ব্যবসাদার। হাকিম ব্যবসাদার—পয়সা লইয়া বিচার-বিতরণ কাজে নিযুক্ত; উকীল ব্যবসাদার—পয়সা লইয়া মোকদ্দমা চালাইতে নিযুক্ত, প্রজা ব্যবসাদার, জমী চসে পয়সা রোজগারের জন্য; জমীদার ব্যবসাদার,—জমীদারী কেনে টাকার জন্য; রাজা ব্যবসাদার - রাজ্য জয় করে, টাকার জন্য; ফল কথা, পৃথিবীর সকলেই ব্যবসাদার। তবে আমাদের এ ব্যবসায় লোকের এত চোক টাটায় কেন? লোকে একটী আমের আঁটী পুঁতে ভবিষ্যতে আম খাইবার জন্য, গাছটী জমা বিলি করিবার জন্য। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, ছাগল তাড়ানো,—সমস্তই সেই ভাবিফল আমটীর জন্য। মানুষ, বিড়াল পুষে, ইন্দুর ধরিবার জন্য; কুকুরকে একমুটা অন্ন দিই, রাত্রিতে আমার বাড়িতে সে পাহারা দেয় বলিয়া। আর এই যে আমার এত-কষ্টের-ছেলেকে মানুষ করিলাম,—ইহা কি বৃথায় যাইবে? দুধভাত খাওয়াইয়া যাদুমণির নবীন নধর গড়ন করিলাম, স্কুলে টাকা খরচ করিয়া একটা পাশ করাইলাম,—এত পরিশ্রম এবং মূলধন খরচ হইল, সমস্তই কি আমার জলে পড়িবে? না, তা কখন হইতে পারে না;

সংসারের তো নিয়ম নয় ? ব্যবসায়ে চক্ষু লজ্জা করিলে, ধনী মাটী হয়। আর চক্ষু লজ্জাই বা কিসের ? উচিত মূল্যে মাল বেচিব,--তোমার পছন্দ হয়, প্রাণ চায়, তুমি লইবে; মনে না ধরে, ফিরিয়া দেখিবে। এ ব্যবসাদারী কাণ্ডে আমি কেন লজ্জাশীলা কণে-বৌয়ের মত ঘোমটা দিয়া বোসে থাক্‌বো ? খাইয়ে মাখিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে, সহবৎ দিয়ে, ছেলেটীকে তৈয়ার করিলাম, এখন তুমি বল কি না,—"আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও, অধিক টাকা দিতে পারবো না।" কেন আমি কম টাকা লইব ? ছেলে বিকায় না কি ? আশ্বিন মাসের পূজার মরশুমে কুটে পাঁটায় কড়ি হয়, আর এই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহব্যবসার ঘোর মরশুমের সময়, আমার যাদুর নিশ্চয়ই দ্বিগুণ দর হবে'—বিশেষ, ইহা খাঁটী মাল, কোন ভেজাল নাই। হরলাল বাবুর মেয়েটী সুন্দরী বলে যে, আমার ছেলের দাম কম হইবে, তাহা কখনই নহে। সে সুন্দরী আছে সেইই আছে—তাতে আমার কি ? ভবিষ্যতে ছেলে চাকুরীদ্বারা রোজগার করিয়া আমাকে টাকা দিবে বটে,—কিন্তু ছেলের মধ্য-থাকের রোজগার আমি ছাড়ি কেন ? আমি কিছু আর গয়াক্ষেত্রে পুণ্য করিতে আসি নাই যে, এখানে টাকা বিলাইব। দোকান খুলিয়াছি, জিনিষ সুমুখে সাজাইয়াছি, চুটিয়ে ব্যবসা চালাইব। বেচাকেনার সময় খাতির, লজ্জা থাকিলে, ব্যবসা চলে না।

বলি, তোমাদের এত হিংসা কেন ? আমি মরশুমে দুটাকা রোজগার করিব, তোমরা তাতে বাধা দিবার কে ? তোমরা নাকি বলে বেড়াও, পণ-প্রথা ভাল নয়, টাকা লওয়া ভাল নয়—কেন ? তোমার নিজের ছেলে একটী তৈয়ারি হলে তখন বুঝ্‌তে

পারবে—টাকা লওয়া ভাল কি মন্দ ? তোমরা নেহাইত অব্যব-সায়ী, তাই ওসব কথা মুখে আনো। উপযুক্ত সন্তান থাকিলে, ওসব কথায় তোমাদের মনে কষ্ট হইত কি না, বুঝিতে পারিতে ? আমিও উঠ্‌তি বয়সে বলিতাম, পণ-প্রথা অতি জঘন্য। কিন্তু যখন ছেলেটী হলো, ঘি দুদ খাইয়ে ছেলেকে বড় করিলাম, তখন বুঝিলাম, পণ-লওয়াকে খারাপ বলা কতদূর অন্যায়। বাপ্‌! প্রাণ থাক্‌তে কি, ও-জিনিষকে-খারাপ বল্‌তে পারি ? আর এখন দু দশ স্থান হইতে ছেলের দর পাইয়াছি, এখন কি আর আমি ছেড়ে কথা কই ? যখন ব্যবসা বাণিজ্য শিখি নাই, তখন মুর্খের মত, "পণ-লওয়া ভাল নয়" বলা সহজ ছিল, কিন্তু এখন ব্যবসায়ী হইয়া অব্যবসায়ীর মত কথা কেমন করিয়া কহিব ?

তবে তুমি একদিন বলিতে পার—"পণ লওয়া ভাল নয়।" সে কোন্ দিন? কোন উপযুক্ত সময়ে?—যখন আমায় মেয়েটির বিবাহ দি, তখন আমিই লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতাম, "হিন্দুসমাজে কি বিষম কুপ্রথা প্রচলিত দেখদেখি ? মেয়ের বিবাহ দিব, গৌরী দান করিব, ইহাতে বরের বাপ বলে, আমাকে নগদ হাজার টাকা দাও। ছি! ছি! ছি!—এ পাপ প্রথা উঠাইবার জন্য পিনালকোডের ধারা বাড়ান উচিত।" কয়েক দিন মাত্র এই কথাটী লোকে আমার মুখে শুনিয়াছিল ; যেন-তেন-প্রকারেণ যাই আমার মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল, অমনি আমি নীরব—ও কথা আর ভুলেও মুখে আনিলাম না। এখন ও-আপদ্ বালাই —মেয়ে আর নাই—কেবল সারি সারি চারিটী ছেলে। এখন আমার পাথরে পাঁচ কীল। এখন আমার হাতে, রঙের গোলাম নহলা-টেক্কা-সাহেব, আর একটী টেক্কা বড় পঞ্জা।

ব্যোমের তাস, আমি এখন ছাড়ি কি? আর, কোন পাষণ্ডের কথায় আমি এ সুখের খেল ত্যাগ করিব? এই আমার প্রথম ছেলের বিয়ে, কাঁটায় ওজন করে, সোণারূপার দানসামগ্রী গহনা নগদ টাকা লইব। কাঁটা এক চুল এদিক ওদিক হলে, সমস্তই ফেরত দিব। বঙ্গে এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ না হইলে আমার সুবিধা নাই। কারণ ক্রমান্বয়ে আমাকে এখন এ ব্যবসা চালাইতেই হইবে। দেশহিতৈষিগণ আমার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এখন কোথায়? শুধু বিধবার বিবাহের আইন জারি করাইলে ত চলিবে না, আমার জন্যও একটা আইন তৈয়ার করিয়া দিন। বঙ্গের অনেক বাপ মা আপনার উপর চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে! ব্যবস্থাসচিব হুইটলী ষ্টোকস্ আজ কোথায়? আপনি বিবাহের কাঁটা-আইন প্রচলিত করুন। তোমরা বুঝি মনে করিতেছ, এ আইনটী পাস্ হইলে কেবল আমারই উপকার! হুঃ কতলোক মনেমনে যে খুসী হইতেছেন, তাহা আর কি বলিব? আমিত অদ্য কাঁটায় ওজন করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলাম; কিন্তু ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য। সেই জন্য বলি, যাঁহারা এ বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাহারা সকলে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। শীঘ্রই আমরা দলবদ্ধ হইয়া, সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে, গবর্ণমেণ্ট সমীপে কাঁটাআইন জারির জন্য প্রার্থনা করিব।

আইনত হইবেই! কতকগুলি মোটামুটী গার্হস্থ্য নিয়ম, ছেলের বাপ্‌কে জানাইয়া রাখিব। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে, ছেলেটীকে 'মোটা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ছেলে দমে খুব ভারি হওয়া দরকার। এজন্য পুত্রকে ঘি, মাখন

ছানা, ননী, দুধ প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। অচিরে ছেলেটী, মোটা নাদুস্ নুদুস্ হইয়া উঠিবে; যত মোটা, তত লাভ। গ্রাম্‌ফেড্ মটন অধিক দরে বিক্রীত হয়। আর আমার এ মাখনফেড্ ছেলে অবশ্যই চুব চড়া মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইবে।

যে উপায়ে হউক, ছেলেটীকে একটী পাশ করাইতে হইবে। ছেলেটীর এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, বর-দেখিতে আসিলে সে বলিবে, সোণার মই, সোণার ঘড়া এবং সোণার পাল্কী নহিলে, সে বিবাহ করিবে না।

একাদশী বাঁড়ুয্যে।

ধনকুবের বলিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের খ্যাতি। লোকে কাণাকাণি করে, তাঁহার শয়ন ঘরে, মাটীর নীচে পোঁতা টাকায় শেওলা পড়িয়া যাইতেছে। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন, তাঁহার ঘরে একটী সুগভীর গুপ্ত কূপ আছে। তাহার প্রথম তবকে মোহর, দ্বিতীয় তবকে নবাবী আমলের গেঁড়ি টাকা, তৃতীয় তবকে সাহেবমুখো টাকা, চতুর্থ তবকে বিবিমুখো টাকা, সাজান আছে। তাঁহার কাছে একশত লাখ, কি একশত কোটী টাকা আছে, এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থিরমীমাংসা হইল না।

ইহা ত গেল ভূগর্ভস্থ গুপ্ত টাকা। ইহা ব্যতীত বহিঃ-প্রদেশে বিস্তর টাকা ছড়ান আছে। কর্জ্জ দান করা তাঁহার জীবনের এক মহাব্রত। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা তাঁহার সুদী কারবারে খাটিতেছে। যাকে তাকে তিনি সহজে ধার দেন না। যিনি বিশেষ বিপদ্গ্রস্ত, তিনিই তাঁহার কর্জ্জদানের

বিশেষ প্রিয়পাত্র। কাল অষ্টমের নিলাম, আজ জমীদার যদু নাথ বাবু গিয়া তাঁহার হাত ছুটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "বাঁড়ুয্যে মহাশয়, এবার আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আর দিন নাই, আজই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে হইবেই হইবে। আপনি না দিলে আর উপায় নাই।"

বাঁড়ুয্যে। তাইত; টাকা ত আমার হাতে নাই। যা ছিল, সবই গিয়াছে, রাম হরি বাবু সে দিন ষাট হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া গেলেন। বোল্‌বো কি, হাতে যদি আমার একটা কাণা কড়ি থাকে, তবে সে গো-রক্ত, ব্রহ্ম রক্ত!

যদু। সে কি মহাশয়! আপনার হাতে টাকা নাই কি? আপনি না দিলে এখন যাই কোথা? দেখুন, খুঁজে পেতে; আপনার অক্ষয়ভাণ্ডারে টাকা খুঁজলেই পাওয়া যাবে!

বাঁড়ুয্যে। আর কি সেকাল আছে? এ বৎসর যে কি করে সংসার চালাবো, তাই ভাব্‌চি। চাল, ডাল, তেল সবই মাগ্‌গি;—হাতে একটী পয়সা নাই;—মেয়েদের কাছে হাওলাত করে, এ মাসের খরচ চালিয়েছি। বানে দেশ ভেসে গেল; আমার নিজ জোতের জমীতে এক ছটাক ধান নাই। ভেবে ভেবে আমার গায়ের রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে। শিরঃপীড়ার দরুণ কবিরাজ আমাকে মাথায় একটু বেশী তেল মাখিতে ব'লেছেন; তা যদু বাবু আপনার কাছে এ কথা গোপন করে আর ফল কি?-এ বছর আমি ভরসা করে মাথায় একটু বেশী তেল মাখিতে পারি না। সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদে উঠিতে হলে মাথা ঘোরে। তা কি করবো? পয়সা নাই, দুর্ব্বৎসরে কুলায় না, কাজেই কষ্ট করে থাকতে হয়।"

বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের প্রকৃত পক্ষেই গা ও মাথা রুখু। চুলগুলা ফর্ ফর্ করিতেছে। সত্য সত্যই জলপ্লাবনের পর দিন হইতে তিনি তেল মাখা কমাইয়াছেন। কোন দিন একটু তেল মাখেন, কোন দিন বা একেবারেই ফাঁক দেন। পায়ে, গ্রাম্যমুচির তৈয়ারি, মান্ধাতার আমলের এক জোড়া ছেঁড়া চটী জুতা। পরিধানের কাপড়খানি খুব মোটা,—দুই তিন স্থানে তালি দেওয়া, কিন্তু তাহা হাঁটুর নীচে অধিক নাবে নাই। তবে হরে দরে ঠিক আছে। ঐ মোটা ঘন কাপড় একটু পাতলা হইলেই তাহা অবশ্যই ভূমিতলে লুটাইত। হিসাবে গোল নাই; তবে এ সব গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার জন্য একটু সূক্ষ্মবুদ্ধির আবশ্যক। এই নিদারুণ শীতকালে মোটেই তাঁহার গাত্রবস্ত্র নাই। রাত্রে একখানি নিজহস্তে শেলাই করা কেঁথা গায়ে দেন। খুব ভোরে উঠিয়া, কোঁচার টেপ গায়ে দিয়া, সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিতে যান। এক এক দিন শীতে হি হি করিয়া কাঁপিয়া উঠিলে, তিনি সুর করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানঃ—

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ, ভোজনেচ জনার্দ্দনং।
দুস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিপর্দি মধুসূদনং॥

হঠাৎ কারও সহিত তখন সাক্ষাৎ হইলে, তিনি বলেন, কাপড় গায়ে দিয়া ত ফুল তুলিবার যো নাই; কি করি, কাযেই আদুড় গায়ে এ শীতে ফুল তুলিতেছি।' ফুল তোলার পরই গৃহে আসিয়া রোদে পিঠ দিয়া, তামাক খাইতে বসেন। দেখিতে দেখিতে ৯ টা বাজিয়া যায়, সূর্য্যের তেজ প্রখর হয়। সুতরাং গায়ে বস্ত্র দিবার আর সময় হয় না। আর সন্ধ্যার পর বাহিরে তিনি কোন দিনই বসেন না,

একপ্রয়ে গৃহে গিয়া, নিজকক্ষে সেই কেঁথা, গায়ে দিয়া, শুইয়া থাকেন। তবে লোকে বলে, তাঁহার অতি পুরাতন কাশ্মীরী একখানি শাল আছে। কিন্তু সে শালখানি আজ প্রায় বার বৎসর হইল, বাহিরে কেহ দেখে নাই; প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন, ৭১ সালের ঝড়ের বৎসর ঐ সাল তাঁহারা এক দিন দেখিয়াছিলেন। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের একটী পুকুর আছে—তাহাতে বিস্তর বড় বড় মাছ! কিন্তু তিনি একটী মাছও ধরেন না,—বলেন, জীবহিংসা মহা পাপ! স্বয়ং কাঁচকলা ভাতে, খেসারির ডাল ভাতে, তেঁতুল গুলে ভাত খান,—আর বাড়ীর মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে বড় বড় মাছ ধরিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ হজম করেন। কর্ত্তাটী যতই অহিংসা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এ দিকে ততই পুকুরের মাছ কমিয়া যায়। গিন্নীটী, কর্ত্তাকে বুঝাইয়া বলেন, মাছ সব ভোঁদড়ে খাচ্চে।

এখন আসল কথা। যদু বলিলেন, যদি পাঁচ হাজার টাকা না পারেন, আমাকে যেমন করিয়া হউক, আজ চারিটী হাজার টাকা দিতে হইবে।

বাঁড়ুয্যে। কি জানেন যদু বাবু, আমার হাতে ত একটী পয়সাও নাই। মেয়েদের কিছু টাকা আছে। তা মেয়েরা বেশী সুদ না হলে টাকা কর্জ্জ দেয় না। সুদই তাদের উপজীবিকা; আমার নিজের টাকা থাক্‌লে, টাকা প্রতি মাসে দুই পয়সা সুদ দিলেই চলিত। মেয়েরাত কারো কথা শুনে না, তারা চারি পয়সা সুদের কম টাকা ছাড়বে না।

যদু। বলেন কি মোশাই, আমি যে একবারে মারা গেলাম।

এত সুদ দিতে হ'লে যে আমি সর্ব্বস্বান্ত হবো। একটু দয়া করুন—

বাঁড়ুয্যে। সুদই আমাদের সম্বল। আমার জমীদারী নাই, লাখরাজ নাই, বাগান নাই, অধিক কি, যে দুবিঘা জমী ছিল, তাহাতেও এবৎসর ধান নাই। একজনকে দশটাকা দান করিতে পারি, কিন্তু সুদের একটী পয়সাও ছাড়িতে পারি না। নদে জেলার রামহরি ঘোষালের সহিত আমার বরাবর কারবার চলিয়া আসিতেছে; এই পুজার পুর্ব্বে তাঁরকাছে সাড়ে আটশত টাকা দশ আনা আড়াই পয়সা সুদের পাওনা হলো। তিনি বলেন, আড়াই পয়সা আর দিব না; আমি বলিলাম, মহাশয় মাপ করিবেন, সুদ কম লওয়া নীতিবিরুদ্ধ। এক জনের কাছে কম লইব, অপরের কাছে বেশী লইব—ইহা বড়ই অন্যায় কথা। লোকে আমাকে জুয়াচোর, ঠক বলিতে পারে। বিশেষ, এখন যদি আপনার কাছে কম সুদ লই, তাহা হইলে রামহরি ঘোষাল মহাশয় বড়ই দুঃখিত হইবেন।

যদু। বাঁড়ুয্যে মহাশয়! আপনি এ কথা রামহরি ঘোষালকে নাই বা বলিলেন? আমাকে কম সুদ দিলে কেহই জানিতে পারিবে না।

বাঁড়ুয্যে। (হাহা করিয়া হাসিয়া) এখানে কেউ না জানিতে পারেন—সেই অন্তর্যামী ভগবান ত সব জানিতে পারিবেন। পাপত মনে। তা হবে না—আজ টাকা প্রতি চারি পয়সা সুদ দিলে, মেয়েদিগকে বুঝাইয়া, বহুকষ্টে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা এনে দিতে পারি।

যদু। না হয়, মোশাই তিন পয়সাই নেবেন, চারি পয়সা সুদ লইলে একেবারে মারা যাব।

বাঁড়ুয্যে। তা হবে না, আমি কথার ঠিক রাখি। আমার কাছে কস্মিন্ কালে আপনি দু কথা পাবেন না। কথার যার নড় চড় হয়, সে মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহে। আমার মরা বাপ যদি ফিরে এসে বলেন পৌণে চারি পয়সা সুদ লও, তাহা হইলেও রাজি হই না।

যদু। [যোড়হাতে] আপনি আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন —আপনার আমি পায়ে ধরে—

বাঁড়ুয্যে। ছি ছি! আপনি অতি বড় লোক, সম্ভ্রান্ত কুলীন। আপনার খেয়েই আমরা মানুষ। আমি আপনার চাকরেরও যোগ্য নই। আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে কি আপনার হাত যোড় করিতে আছে ?

যদু বাবু গতিক দেখিয়া নীরব হইলেন। তখনই জমীদারী বন্দক দিয়া যদু বাবু, বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে খত রেজেষ্টরি করিয়া দিলেন। অমনি পাঁচটা তোড়ায় পাঁচ হাজার টাকা বাঁড়ুয্যে মহাশয় গণিয়া দিলেন। যদু বাবু বলিলেন, "আপনার ঘরে নোট নাই কি ?

বাঁড়ুয্যে। নোট আমি বুঝি না। আমার নগদ টাকার কারবার।

যাত্রাকালে যদু বাবুকে বাঁড়ুয্যে বলিলেন, 'এক ছিলিম তামাক খাইয়া যান—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হলো।" যদু বাবু তখনও বাসিমুখে একটুও জল দেন নাই,—স্নান আহ্নিক করেন নাই, বিষম বিষয় চিন্তায় অন্তরটা তাঁর ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তিনি আর পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন না, বেগে অষ্টমের টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

একটা বড় গোলের কথা আছে। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের নাম কেহ জানে না। সকলে তাঁহাকে একাদশী বাঁড়ুয্যে বলে। দশ খানি গ্রামে, অথবা বঙ্গের সর্ব্বত্রই তাঁহার ঐ নাম রাষ্ট্র। ক্রমে আসল নাম লুপ্ত হইয়া ঐ নামই প্রচার হইয়াছে। ফল কথা, তাঁহার পিতৃদত্ত আদত নাম তাঁহার গৃহিণী ব্যতীত আর কাহারও স্মৃতিপথে আছে কি না সন্দেহ। বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে কেহ একাদশীই বলুক, আর পূর্ণিমাই বলুক, অথবা ধরিয়া কেহ দুখা জুতাই মারুক, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; কড়ায় গণ্ডায় কাগ ক্রান্তিতে তিনি হিসাব করিয়া সুদ পাইলেই মহাসন্তুষ্ট। কিন্তু দুষ্ট লোকে তাঁহাকে দেখিলেই আপন মুখটী অমনি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলে। তাস খেলিতে খেলিতে যদি একপক্ষ চারিখানা কাগজ ধরে, অপর পক্ষে তৎক্ষণাৎ "একাদশী-বাঁড়ুয্যে-রবে" সেই তাস চারিখানায় এক হাত বুলাইয়া দেয়। এমনি তাঁহার নামমাহাত্ম্য, নিশ্চয়ই সেই চারিখানা তাস উঠিয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঁড়ুয্যে মহাশয় এক জন দেশবিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিহাসে তাঁহার নাম উঠিবে কি না, ঐতিহাসিকগণ এখন কেবল দিবারাত্র এই ভাবনাই ভাবেন।

দ্বিতীয় ভাগ

সমাপ্ত